চেনা, আধচেনা মানুষের মুখ, মুখের মিছিল

সকালে, এই ধরো আটটা থেকে দশটা তাঁকে বাজার অঞ্চলে দেখা যাবে। তিনি দ্রুত। সারাক্ষণ দ্রুত। এই মিউনিসিপ্যালিটির গলি দিয়ে ঢুকলেন তো ওই ধাঙড়পাড়ার মুখ দিয়ে বেরলেন। এইমাত্র যদি জলের ট্যাঙ্কের নীচে একজনকে থামিয়ে কথা বলছেন, আর সে উসখুস করছে—অমনি দশ মিনিট পরেই তারকনাথ গ্রন্থালয়ের সামনে একজনকে ধরে তার সঙ্গে কয়েক পা হাঁটছেন। কথা বলতে বলতেই।

সকালে ওই সময়টাতেই সবার অফিস যাওয়ার তাড়া। সেই তাড়ার মুখটাতেই তিনি ঠিক ধরে ফেলবেন পথচলতি অবস্থায় সবাইকেই। আর সকলেই পালাই-পালাই করবে। একজন যেই তাঁর হাত ছাড়িয়ে ছুটল, অমনি তাঁরও মনে পড়ল তিনি তো বাজারে বেরিয়েছেন! অথবা কয়লার দোকানে যাবেন। কিংবা অক্ষয়ের গম ভাঙানোর কলে পৌঁছবেন, নয়তো ভোম্বলের রেশন দোকানে। এর কোনও একটা-দু'টো-তিনটে কাজ নিয়ে বেরিয়েছেন তিনি বাড়ি থেকে। কিন্তু পুলিনকে দেখে, বা বোকা বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা হতে, অথবা ভোলা মজুমদার তাঁর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়গুলোতে তিনি দাঁড়িয়ে পড়েছেন। তারপর তারা যে যার কাজে চলে যেতে, তিনি পড়িমরি ব্যস্ততায় নিজের ফেলে রাখা কাজগুলোর কোনও একটার দিকে যেতে শুরু করেছেন। সেইসব কাজের জন্য ততক্ষণে যথেষ্টই দেরি হয়ে গিয়েছে—সেই সম্বিত ফিরতেই তিনি দ্রুত।

তা হলে কী দাঁড়াচ্ছে? যেই তিনি পথচলতি চেনা লোক দেখছেন, অমনি থেমে যাচ্ছেন। আর লোকটির সঙ্গে কথা বলতে বলতে ঘুরে লোকটিরই গন্তব্যের দিকে কিছুক্ষণ হাঁটছেন, তারপর নিজের কাজের দিকে ফিরছেন। ফলে, তাঁকে সারাক্ষণই ট্রেনের মতো লেট মেক-আপ করতে হচ্ছে। তাই তিনি দ্রুত। সারাক্ষণ দ্রুত।

তিনি মানুষটা ছোটখাটো। ধুতি আর ফতুয়া গায়ে। হাতে বাজারের ব্যাগ। নয়তো রেশনের থলি। নইলে গম-ভরতি ঝোলা—কখনও দু'হাতে দু'টো ফ্যান্সি জুতো। মুচি যেখানে বসে, সে জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছেন—কখন তার হাত-অবসর হয়। হঠাৎ কাউকে দেখে, এগিয়ে এলেন রাস্তার অন্য পাশে। থামিয়ে কথা বলতে লাগলেন। কথার মাঝখানে তাঁকে জুতো সারাইওয়ালা ডাকল। তবু তিনি যেতে চান না। যে লোকটিকে থামিয়ে কথা বলছেন তখন, সে চলে যেতে চাইছে প্রাণপণে। বলছে, দেখুন ওর হয়ে গিয়েছে। ডাকছে আপনাকে। তাও তিনি যাবেন না। কথা শেষ করে যখন মুচির কাছে পৌঁছলেন তখন সে অন্য কাজ ধরে ফেলেছে। ফলে আবার তাঁর দেরি। ফলে, ফেরার সময় আবার তিনি দ্রুত।

এই হলেন তিনি। দুগ্গা মেসোমশাই। মাথার সামনের দিকে চুল নেই, পিছন দিকের চুল কী এক অজ্ঞাত কারণে হাওয়া লাগলে খাড়া। দুপুরে যদি ঘুমোন বিকেলে খাড়া। সকালে বাজারের পথেও খাড়া। মুখটা গোল। গৌরবর্ণ, রোদে পুড়ে-পুড়ে কালচে। ষাট পার হয়েছেন চার-পাঁচ বছর তো হবেই। রিটায়ার করেছেন। কিন্তু অমন ছটফটে মানুষ সারা টাউনে নেই।

দুগ্গা মেসোমশাই কিন্তু নামকরা লোক। দুগ্গা মেসোমশাই রেডিওর গীতিকার। চাকরি একটা করতেন, কিন্তু কোনওদিক দিয়েই সেটা তাঁর পরিচয় নয়। আমি রেডিও-য় কত গান লিখেছি, বলতেন প্রায় সব কথাতেই। তখন রেডিও বলত সবাই। আকাশবাণী বলত না। মানে ওইরকম মহানগর থেকে দূরের এলাকার লোকেদের কথা বলছি। কলকাতার লোকে তখন কী বলত, কী জানি! কিন্তু 'আকাশবাণী করি', 'শ্রুতি করি'—এসব কথা তারও অন্তত কুড়ি বছর পর মফস্‌সলগুলোতে চালু হবে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে। যারা বহু কষ্ট করে ভিড়ভর্তি ট্রেনে জার্নি করার পর, কলকাতার মঞ্চে বা রেডিও স্টেশনে এবং দূরদর্শনে অনুষ্ঠান পায়। দূরদর্শন বা টিভি-র চল তখন ঘরে-ঘরে নেই। '৭৭ সালে, ফুটবলার পেলে কলকাতায় আসার কারণে একটি বাড়িতে টিভি এসেছিল। পুরো টাউনের লোক ভেঙে পড়ল সে-বাড়িতে। ছাদে টিভি তুলে, গৃহকর্তাকে মাথায় ম্যারাপ খাটিয়ে দিতে হল, পাছে বৃষ্টি হয়। মোহনবাগানের সঙ্গে কসমস-এর খেলা ছিল।

আমি যা বলছি, তা সাতাত্তরের আগের কথা। টিভি জিনিসটা দুগ্গা মেসোমশাইয়ের জীবনে নেই। আছে রেডিও। ট্রানজিস্টর। বলা বাহুল্য তখন এফএম আসেনি। রেডিও দুগ্গা মেসোমশাই শুধু তখনই শোনেন যখন তাঁর লেখা গান কোনও শিল্পী পরিবেশন করেন রেডিওতে। সাইকেল চালান না। হেঁটে-হেঁটে সবার বাড়ি গিয়ে বলে আসেন অমুক দিন অমুক সময় আমার গান আছে। রেডিওতে বাংলা আধুনিক গানের যে অনুষ্ঠানগুলো তখন হত, তাতে দুগ্গা মেসোমশাইয়ের লেখা গান বাজত প্রায়ই। এবং নামটি ঘোষণা করা হত গীতিকার হিসেবে। দুগ্গা মেসোমশাই অবশ্য দুর্গাপদ ভট্টাচার্য নামে লিখতেন না। ছদ্মনাম নিয়েছিলেন। জপমালা ঘোষ, আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধুরী মুখোপাধ্যায়ের মতো শিল্পীরাও দুগ্গা মেসোমশাইয়ের লেখা গান রেডিও সিটিং-এ গেয়েছেন।

এবং এজন্য দুগ্গা মেসোমশাইকে নিয়মিত কলকাতা যেতে হত। দুগ্গা মেসোমশাই বলতেন, পড়ে থাকতে হয় বুঝলে? গিয়ে পড়ে থাকতে হয়। রেডিও অফিসে যাবেন বলে যখন বেরতেন দুগ্গা মেসোমশাই, তখন কিন্তু ফতুয়া নয়। পাটভাঙা ধবধবে ধুতি-পাঞ্জাবি। কাঁধে একটি চাদর। যদিও মাথার পিছনে চুল তেমনই খাড়া।

স্বপন ঠিক করল, সেও রেডিওর গীতিকার হবে। যাতায়াত শুরু করল দুগ্গা মেসোমশাইয়ের বাড়ি। দুগ্গা মেসোমশাইও বেশ পছন্দই করেন স্বপনকে। কারণ, রাস্তায় দাঁড় করালে স্বপন, স্বপনই একমাত্র, পালাই-পালাই করে না।

অন্যরা অমন করে কেন? দুগ্গা মেসোমশাই কেবলই তাঁর অতীত দিনের গল্প করেন যে! তারাশঙ্করের বাড়িতে একবার গিয়ে গান পড়ে শুনিয়েছিলেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁকে তিনবার চিঠি লিখেছিলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাড়িতে তো প্রায়ই যেতেন। আজ পর্যন্ত যে একটিমাত্র বাংলা সিনেমায় তাঁর লেখা দু'টি গান নেওয়া হয়েছিল, সেটা তো প্রেমেনদা বলে দিয়েছিলেন বলেই! ছায়াছবির গানে সে-গান দু'টো বাজানোর জন্য তিনি কতবার রেডিও স্টেশনে গিয়ে বলে এসেছেন—কিন্তু ওরা কেন যে বাজায় না কে জানে। এমনিতে পুলক তো দুগ্গাদা দুগ্গাদা করে। রেডিও-র ক্যান্টিনে চা খাওয়ায়। মানে তোমাদের পুলক ব্যানার্জি আর কী। ভারি ভাল ছেলেটি। গৌরীবাবুর বাড়িতেও গিয়েছি। গৌরীপ্রসন্ন। চা, সিঙাড়া, রসগোল্লা খাওয়ালেন। দুপুরে খেয়ে যেতেও বলেছিলেন। কিন্তু আমার তো তাড়া থাকে বোঝোই!

তাড়া যে দুগ্গা মেসোমশাইয়ের আছে, সেটা তো বোঝা যায়! তিনি সবসময় প্রায় ছুটছেন। সবচেয়ে ভাল সেটা বোঝে স্বপন। কারণ স্বপন দুগ্গা মেসোমশাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা পথই হাঁটে রোজ। কারণ স্বপন রেডিও গীতিকার হবে। তবে দুগ্গা মেসোমশাইয়ের বাড়ি যাওয়ার সময় স্বপন আমাকে সঙ্গে নেবেই।

কারণ? স্বপন নাকি লজ্জা করে। কেন? দুগ্গা মেসোমশাইয়ের মেয়েরা আছে যে!

দুগ্গা মেসোমশাইয়ের পাঁচ মেয়ে। তার মধ্যে প্রথম তিনজন জুয়েল। দেবীদি, বেবিদি আর মশা। দেবীদি, বেবিদি রাস্তায় বেরলে দোকানঘরগুলো অবধি কাঁপে। পানের দোকানের আয়না তার ফিক্সড জায়গা থেকে ঘুরে যেতে চায়। আয়না বলতে চায়, আমিও দেখব যতক্ষণ দেখা যায়। দরকার হলে মাটিতে পড়ে ভেঙে যাব, তবুও দেখব। সেখানে পাড়ার ছেলেদের আর দোষ কী! দেবীদি ইউনিভার্সিটি পাস করে ডব্লিউবিসিএস পাস হয়েছে। এই বিডিও-এসডিও হল বলে। বেবিদি এমএসসি পাস করেছে সোনার রেজাল্ট করে। এখন নৈহাটি, শ্যামনগর, কল্যাণী—এমনকী কলকাতারও একটা কোচিং সেন্টারে পড়ায়। সপ্তাহে চারদিন-পাঁচদিন কলকাতা যায় দেবীদি, বেবিদি। আর মশা? মশা আমাদের চেয়ে কিছু ছোট। কিন্তু ঝলকানিতে বড় দুই দিদিকে হারিয়ে ফিরেছে। সে বছর লাস্ট হায়ার-সেকেন্ডারি, তিনটে লেটার নিয়ে বেরিয়ে কলেজে ঢুকেছে মশা। মশার ভাল নাম কণিকা। দেবীদি, বেবিদি-র ভাল নাম জানতাম না। পরের দু'টো ছোট। ইস্কুলে পড়ে। দুগ্গা মেসোমশাইয়ের একটা পৈতৃক বাড়ি ছিল। তিনি চাকরি করার সময়ে অফিসের কাছে, সহকর্মীদের কাছে, এবং কাবুলিওয়ালাদের কাছেও এত পরিমাণ ধার করে গিয়েছেন সারা জীবন যে প্রায় নিঃস্ব হাতেই তাঁকে রিটায়ার করতে হয়। মেয়েরা উচ্চশিক্ষা লাভ করল কী করে? কেন, প্রেমিকরা ছিল! দেবীদি, বেবিদি-র প্রেমিকরা। তখন বয়ফ্রেন্ড বলার চল হয়নি। তিন-চারজন করে প্রেমিক রাখা, সে-যুগে চাট্টিখানি কথা নয়! একজন হয়তো একদিন দেবীদি-র সঙ্গে কলকাতা যায়, কোনও কাজে যাচ্ছে দেবীদি, তাই। একজন হয়তো দেবীদি নৈহাটি থেকে ফেরার সময় স্টেশনে অপেক্ষা করছে। বাড়ি পৌঁছে দেবে। পৌঁছনোর আগে বলবে, দেবী আমার দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে খিদে পেয়ে গিয়েছে। চলো, বাপিদা'র দোকানে একটু মাংসের ঘুগনি আর পরোটা খেয়ে যাই। দেবীদি না-না করবে। তারপর রাজি হবে। তারা বাবার কাছ থেকে একটা জিনিসই শিখেছে, 'তাড়া থাকা' ব্যাপারটা। বেবিদি-র জন্য একজন আসে বারাকপুর থেকে। সে নাকি ইউনিভার্সিটি-র প্রফেসর। মাঝে মাঝে আসে। আর একজন আসে খোদ কলকাতা থেকেই। সে যে কী, কেউ বলতে পারে না। সেই সঙ্গে এই টাউনের ছেলেরা তো আছেই। কেউ কন্ট্রাক্টরিতে নতুন উঠেছে। কারওর তিনটে লরি। একটা লাক্সারি বাস। বিয়ে, দিঘা-ভ্রমণ, তারাপীঠ যাওয়া এইসব পারপাসে ভাড়া দেয়। এরা সকলেই আছে। দেবীদি, বেবিদি এদের সকলকেই সামলায়। প্রশ্ন উঠতে পারে, কলকাতা থেকে একজন ট্রেনে সঙ্গে করে নিয়ে এল, ছোট টাউন, সে কি জানবে না, আর একজন ছেলে পরদিনই ওই মেয়ের সঙ্গে বাপিদার দোকানে গিয়ে বসছে? জানবে! কিন্তু ম্যারাথন দৌড়ে যখন পঁচিশজন দৌড় শুরু করে, তারা কি জানে না আরও চব্বিশ জন দৌড়চ্ছে? জানে। জেনেও দৌড়য়। এরাও তাই। কে পাবে কাপ।

দেবীদি, বেবিদি-র এই প্রসেস, মশাও নিয়েছে। এবং সফলভাবে। এইবার আসছে আসল কথা। এই সকল-সমস্ত-সর্ববিধ ঘোরাঘুরিই কিন্তু প্লেটোনিক ঘোরাঘুরি। জনসমক্ষে। দিনের বেলা স্টেশনে তুলতে আসছে, বা তুলে দিয়ে নিজেও উঠে পড়ছে ট্রেনে, মানে প্রেমিকরা। একজন প্রেমিক পৌঁছে দিল নৈহাটি অবধি সকালে। তারপর তাকে টা-টা বাই-বাই। অনন্তদা বলে একজন ছিল। বেলা সাড়ে বারোটায় তাকে ঘর্মাক্ত মুখে রিকশা ধরতে দেখা যাচ্ছে স্টেশনের সামনে। সে হা-ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরছে, কেননা নৈহাটি পৌঁছে দিতে গিয়েছিল সে-ই। এইবার নৈহাটি থেকে ফেরার সময় কিন্তু দেখা যাবে নৈহাটি স্টেশনে সন্ধের সময় লাল্টু স্যর দাঁড়িয়ে আছেন। লাল্টু স্যর একজন যুবক-স্যর। ইস্কুলে পড়ান। কিন্তু অর্ডিনারি স্কুলটিচার হয়েও দেবীদি বা বেবিদি'কে লাভ করার উচ্চাশা রাখেন। স্বপ্নের পোলাওতে তো ঘি ঢালতে খরচা নেই! লাল্টু স্যরের সঙ্গে

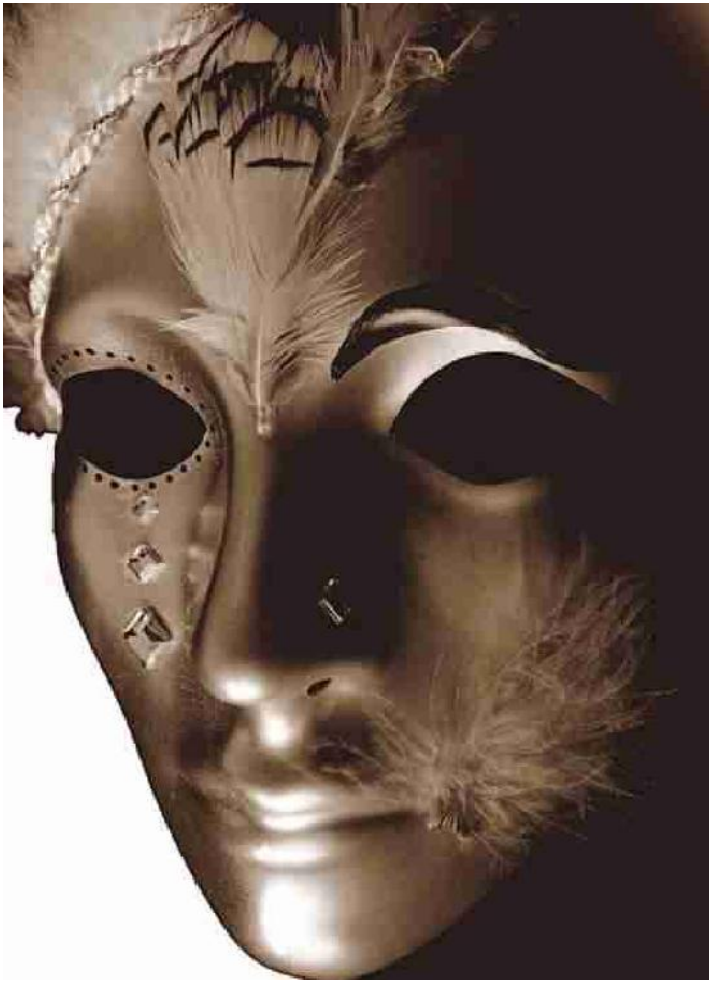

ফিরছে দেবীদি বা বেবিদি। অনেক সময় দেখা যেত দু'মাস আগে দেবীদি-র সঙ্গে ঘুরত যে, সে আজ বেবিদি'কে নিয়ে ট্রেনে উঠছে। এইখানেই প্লেটোনিক কৌশলটা কাজ করত। সবার সামনে ঘোরাঘুরি, খোলা দোকান বা রেস্তোরাঁয় বসা। ট্রেনে যাতায়াত, সবটাই দিনেরবেলা, জনাকীর্ণ সন্ধেবেলা। বাড়ি ফেরার সময় একটু আধো-অন্ধকার গলি, সেটুকুতে দেবীদি, বেবিদি দুঃখের কথাটুকু আরেকবার বলে নিত। নিজের বা বোনেদের অমুক পরীক্ষার ফি হিসেবে তত টাকা জমা করা যাচ্ছে না। আর তারা আশ্বাস দিত : আহা, আমি তো আছি। বাড়িতে ঢোকার আগে—হয়তো যেন সাহস দিচ্ছে—এইভাবে একটু কাঁধে হাত দিয়ে নিল। আর তৎক্ষণাৎ মুচড়ে দূরে গিয়ে দেবীদি বা বেবিদি বলল, বাড়িতে দেখতে পাবে! ধ্যাৎ। এসব কী। কিন্তু স্ট্রিট লাইটের আলোয় তাদের চোখ অন্য কথা বলল। ছেলেটি পরের দিনই সকালে বা সন্ধ্যায়—পরবর্তী তিনদিনের মধ্যে যে-পরীক্ষার ফি দেওয়া দরকার—তা এনে জমা করে দিল।

প্রশ্ন করো, এসব আমি জানলাম কী করে? এত নিভৃত মুহূর্তের কথা!

হ্যাঁ, কী করে জানলে? জানলাম, এরা যখন দেবী-আকাশ বেবি-আকাশ থেকে টুপটাপ খসে পড়তে লাগল, তখন আমার ঝুড়ি পেতে রাখলাম। তারা সব আমার ঝুড়ির মধ্যে পড়তে লাগল। অর্থাৎ দাগা খাওয়ার পর তো প্রাণের ইয়ার একজনকে লাগেই। যারা হাফসোল খেয়েছে তারাই বুঝবে। আমি তখন হতাম তাদের প্রাণের ইয়ার। ইয়ে, আমি আর স্বপন। কারণ আমাদের দুগ্গা মেসোমশাইয়ের বাড়িতে যাতায়াত ছিল তো। যে যখন বাতিল হত প্রেমিক হিসেবে, তার মনের যত দুঃখ, জ্বালাযন্ত্রণা সব আমাদের কাছে ওগরাত।

দেবীদি যখন দেখত লোকসংখ্যা বেশি হয়ে যাচ্ছে, বেবিদি-র কাছে ট্রান্সফার করত। বেবিদি তখন এমনও বলত, দি'ভাইয়ের এমন করা উচিত হয়নি আপনার সঙ্গে অনন্তদা। অনন্তদা বা লাল্টু স্যর হাতে চাঁদ পেত। ভুল বলছি। চাঁদ কিন্তু তারা কেউ হাতে

পায়নি। সে আশায় বাঁধি খেলাঘর। সবই ওই প্লেটোনিক চাঁদ। মাংস-রুটি, বা কাটলেট ইত্যাদি খাওয়া, এবং সিনেমা দেখা। সিনেমা হলেও কেউ হাত ধরার বেশি এগোতে পারেনি। কারণ এক কথা দুই মেয়েরই মুখে। ছিঃ। বাবার একটা সম্মান আছে না। আমার বাবাকে রেডিও-য় সবাই চেনে। আবার চোখে ঝলক নয়তো গলায় আগুনে-ফিসফিস ঢেলে : ওসব পরে হবে। এখন না।

ওই 'পরে'-টা আর কখনও আসত না। এ-ব্যাপারে মশা-র মাথা ছিল তার দিদিদের থেকেও পরিষ্কার। মশা এমনিতে ভাল। মশাকে মশা বললে মশা কিছু মনে করত না। এদিকে টাউনের সবচেয়ে বড় হোলসেল ডিলারের ছোটছেলে হয়ে পড়ল মশার অনুরক্ত। সে মশার সব খরচ বহন করত বলাই বাহুল্য। কিন্তু মশা এমন সেয়ানা, তার সঙ্গে কলকাতা যাবে, ফিরবে, ঠিকই। কিন্তু কখনও কোনও একা ঘরে বসবে না। ছেলেটির বিশাল তিনতলা বাড়ি। ফাঁকা-ফাঁকা ঘরগুলো হু-হু করে দুপুরবেলা। মশা ছেলেটির সঙ্গে শিয়ালদায় নেমে কলেজ পর্যন্ত হাঁটবে। কলেজ থেকে বেরিয়ে খাবে। আবার হাঁটবে। আর শিয়ালদা স্টেশন থেকে মশাদের কলেজ কতটুকুই বা। তাই মশা বলবে, চলো আমরা একটু গলি দিয়ে ঘুরে ঘুরে যাই। এইটুকু তো পথ। ফুরিয়ে যাবে এক্ষুনি। ছেলেটি আহ্লাদে আটখানা। মনের খুশিতে চলল। যেই ট্রেন এল, মশা বলল—আমি কিন্তু লেডিসে উঠব। নৈহাটিতে ট্রেন একটু বেশিক্ষণ দাঁড়াবে। তুমি জানলায় এসো কিন্তু। বেচারি যাকে প্রেমিকা মনে করছে সে লেডিসে বসে যাচ্ছে। এ ভিড়ে গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে।

প্রথম যেদিন স্বপনের সঙ্গে দুগ্গা মেসোমশাইয়ের বাড়িতে ঢুকছি, সন্ধে হয়-হয়। ভাঙা ছাদের ওপর কোথা থেকে একটা গলা বলল : কে? ওখেনে কী!

তাকালাম। ন্যাড়া ছাদ। বিরাট বড়সড় চেহারার একজন মহিলা সেখানে দাঁড়িয়ে। কাপড় আলুথালু। মাথার চুল রুক্ষ এবং খোলা। স্বপন বলল, আমরা। দুগ্গা মেসোমশাইয়ের কাছে এসেছি।

পুরনো বাড়ি, সামনে উঠোন। বেশ বড় একটা ইঁদারা। তার সামনে আমরা দাঁড়িয়ে। স্বপন আবার বলল, দুগ্গা মেসোমশাই বাড়ি আছেন? মহিলা তাঁর ভাঙা-ভাঙা গম্ভীর গলায় বললেন, কুয়োর জলে ভেসে উঠেছে, মরা মুখ দেখা যাচ্ছে। আমি আর স্বপন স্তম্ভিত। কী-ই বলছেন মহিলা? তিনি আবার বলছেন, স্নান করে এসে দেখো। পুজো দিয়ে এসে দেখো। ঘুম ভেঙে উঠে দেখো। দেখবে মরা মুখ ভেসে উঠেছে। আমি ঘুম ভেঙে রোজই দেখি।

ঠিক এই সময় মশা এসে দাঁড়াল মহিলার পিছনে। মা-আ, ঘরে চলো। আপনারা দাঁড়ান। মহিলাকে ছাদ থেকে নিয়ে চলে গেল মশা। তারপর নীচে এসে বলল, আপনারা একটু বসুন। বাবা ওষুধের দোকানে গিয়েছে।

একটু পরেই দুগ্গা মেসোমশাই ফিরলেন। হাতে ওষুধপত্র। মশা এসে দাঁড়াল। মশার হাতে সব বুঝিয়ে দিলেন। বললেন, এই তোর মায়ের ওষুধ। আর শোন, তোর জুতোজোড়া সারিয়ে পালিশ করে এনে দিয়েছি, দেখেছিস তো? মশা বলে, হ্যাঁ দেখেছি তো। তুমি জুতো নিয়ে গেলে কেন। আমি স্বরূপদাকে বললেই কাল মুচি ডেকে আনত বাড়িতে।

আমাদের গানের আসর বসল। দুগ্গা মেসোমশাই প্রথমে স্বপনের লেখা শুনলেন। সুখ্যাতি করলেন। তারপর নিজের একটা নতুন লেখা গান পড়ে শোনাবেন বলে খাতাটা সবে খুলেছেন। বেবিদি, দেবীদি একসঙ্গে ফিরল। মেয়েরা ফিরেছে। আজ থাক। উঠে পড়লেন দুগ্গা মেসোমশাই। স্বপনকে প্রতিশ্রুতি দিলেন, একদিন রেডিও স্টেশনে নিয়ে গিয়ে সবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন। আলাপ-পরিচয় না থাকলে হয়? এত মিষ্টি হাত তোমার। তবে রেগুলার যেতে হবে বাবা। কেমন! গিয়ে পড়ে না থাকলে কিছু হবে না। আমি বলি, তা হলে কবে নিয়ে যাবেন ওকে?

আমি ফি হপ্তায় যাই। এবার তো ঘুরে এসেছি। পরের হপ্তায় যাব'খন। তুমি যোগাযোগ রেখো। সন্ধের দিকে এসো। আমি ওই সময় বাড়ি থাকি। পরের সপ্তাহে সন্ধ্যায় যখন গেলাম, তখন দুগ্গা মেসোমশাইয়ের স্ত্রীকে সামনে থেকে দেখলাম। যা বলেছি, খুবই বড়সড় চেহারা। সামনের জংলা মতো বাগানটায় ঘুরছেন। বেড়ার গেট। ঠেলে আমরা ঢুকতেই বললেন, তোমাদের কাছে টর্চ আছে? স্বপনের কাছে ছিল। গরমকাল। ঝোপজঙ্গলের মাঠ পেরিয়ে দুগ্গা মেসোমশাইদের বাড়ি। টর্চ একটা রাখতে হয়ই। মহিলা বললেন, সারা বাড়িতে একটা টর্চ রাখে না এরা। জ্বালাও তো দেখি টর্চটা। দুগ্গা মেসোমশাইয়ের বাড়ির সামনে একটা স্ট্রিট লাইট। তার আলোটা পড়েছে। সমস্ত চুল সাদা। খড়ের মতো। চোখে যে দৃষ্টি, তা আমাকে বা স্বপনকে দেখছে না। ছুটন্ত গাড়ির হেডলাইট রাস্তার পাশের ঝোপজংলায় যেমন অনিচ্ছা সত্ত্বেও আলো বুলিয়ে যায়—সেইভাবে মহিলার দৃষ্টি আমাদের ওপর ঘুরে গেল। টর্চ আছে শুনে সেই চোখ দপদপ করল। মহিলা বললেন, ধরো দিকিনি। এই, এই ইঁদারাটার মধ্যে ফ্যালো দিকিনি। ফ্যালো। স্বপন হতবুদ্ধির মতো ওর টর্চ জ্বালিয়ে ফোকাস করল ইঁদারার গহ্বরে। পাঁচ ব্যাটারির টর্চ স্বপনের। সে চূর্ণী নদী পার হয়ে সন্ন্যাসীবাগানে থাকে। একেবারে গ্রামই প্রায়। পাঁচ ব্যাটারির টর্চ রাখতে হয় সঙ্গে। সাপখোপের ভয় আছে ওদিকটায়। টর্চের আলো নীচে পড়ল। চিকচিক করে নড়ছে কালো জল। মহিলা বলছেন, দ্যাখো তো কিছু দেখা যাচ্ছে? ভাসছে কিছু? তুমি দ্যাখো তো! আমিও দেখলাম। কী! কী মাসিমা। একটা মুখ দেখতে পাচ্ছ কি না বলো তো ! মুখটা ভাসছে। মহিলা কুয়োর মধ্যে ঝুঁকে পড়লেন।

মা-আ, ও-মা-আ! কী করছ। বেবিদি বেরিয়ে এসেছে। কোমর থেকে জাপটে ধরল ওই ভারী মহিলাকে। স্বপনকে বলল, ধরো তো একটু। সুবু আর বিটু ছোট দুই বোন দৌড়ে এল। মহিলাকে ধরে-ধরে নিয়ে যেতে-যেতে বেবিদি বলল, তোমরা বাবার কাছে এসেছ তো? বাবা আজ আমাদের মামার বাড়ি গিয়েছে। রবিবার ফিরবে। তখন এসো।

আমরা হতভম্ব হয়ে ফিরে গেটের দিকে যাচ্ছি, বোনদের কাছে মা'কে দিয়ে আমাদের গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল বেবিদি। তোমরা কিছু মনে ক'রো না। মায়ের মাথাটা তো জানো। অ্যাসাইলামে ছিল কিছুদিন।

অ্যাসাইলাম? তাই না কি?

হ্যাঁ, দমদমে ট্রেন ঢোকার আগে, যে জায়গায় গাড়িটা দাঁড়িয়ে যায়—ওখানে একটা উন্মাদ আশ্রম আছে দেখেছ তো—ওইখানেই ছিল। বড় ডাক্তাররা বলে দিয়েছে। ঠিক হবে না আর। তোমরা কিছু মনে করোনি তো!

আমরা কাঁচুমাচু। কী যে বলেন! বেবিদি বলল, বাবার কাছে শুনেছি, তোমরা ভাল গান লেখো।

আমি বললাম, আমি না, ও লেখে। খুব ভাল। বেবিদি বলল, বাবা নিয়ে যাবে রেডিও-য়, বলছিল। আমারও রেডিও-য় অনেক চেনাজানা। অজিত মুখার্জি বলে একজন আছেন। খুব হেল্পফুল। উনি অবশ্য ড্রামা-র। কিন্তু তাতে কিছু অসুবিধে হবে না। এসো তোমরা। কেমন!

পরের সপ্তাহেই স্বপনের পিতৃবিয়োগ হল। স্বপন পড়ে গেল অগাধ জলে। ওর বাবার ছিল ছোট মনিহারি দোকান। সন্ন্যাসীবাগান থেকে কিছু দূরে চক কেষ্টপুর বলে একটা গ্রামে। স্বপন বাধ্য হয়ে বসতে শুরু করল সেই দোকানে সকাল থেকে রাত। দু'দিন গেলাম সে দোকানে। হিমশিম খাচ্ছে। ব্যবসা কিছু বোঝে না। দু'ভাই, দু'বোন ছোট ছোট। গান লিখেছে কি না কিছু বলল না। আমার সঙ্গে যোগাযোগ কমে যেতে লাগল দিনে দিনে।

কালক্রমে দেবীদি, বেবিদি বিয়ে করে নিল। দেবীদি-র বর ডাক্তার। দেবীদি সরকারি অফিসার হয়ে গেল, পুরুলিয়া না

দিনাজপুর কোথায় যেন পোস্টিং। বেবিদির চাকরি-বর দুই-ই কলকাতার। মশা উচ্চশিক্ষার জন্য দিল্লি চলে গেল। দেবীদি, বেবিদি-র দু'জনেরই একটা করে মেয়ে হল। ছোট দু'টো বোন বড় হয়ে উঠল। তাদের বিয়ে দিল দেবীদি, বেবিদি পাত্র দেখে। মশা স্বাধীন। সে বিয়ে করবে না। ভাল চাকরি করছে হায়দরাবাদে। স্বপনের সঙ্গে দেখা হয় না। কিন্তু ওদের বাড়ির সব খবর আমাকে বলে বড় দু'বোনের প্রাক্তনরা। দুগ্গা মেসোমশাইকেও রাস্তায় কম দেখা যায়। রেডিওতে গান বাজে কি না জানতে পারি না, কারণ খবর দিতে আসেন না। এদিকে দেখতে দেখতে, অন্তত বারো বছর তো পার হয়েইছে এর মধ্যে।

একদিন, আমাদের বাড়ির পিছনের বড় কুলগাছটার নীচে দেখি হাঁটতে হাঁটতে আসছেন। হাতে অনেকগুলো হলুদ ফুলে ভরা ডাল। বাঁদরলাঠি ফুল। কী যে ধীরে ধীরে হেঁটে আসছেন! এত আস্তে হাঁটতে আমি দুগ্গা মেসোমশাইকে কখনও দেখিনি। একেবারে বুড়ো হয়ে গিয়েছেন, হয়তো সেই জন্য।

কেমন আছেন মেসোমশাই? হাসলেন, ভাল। তোমার মাসিমার খবর জানো তো!

না তো, মেসোমশাই।

ওঁর সেরিব্রাল স্ট্রোক হয়েছে। মেয়েরা চলে যাওয়ার পর প্রেসার-টেসার চেক করানো হত না। এখন শুয়ে থাকেন। সামনের ঘরে। একটা অঙ্গ পড়ে গিয়েছে। আমাকেও চিনতে পারেন না।

আমি এত সব জানতাম না। ওঁর সঙ্গে-সঙ্গে হাঁটছি ওঁর বাড়ির দিকে। বললেন, মেয়েরা টাকা পাঠায়। আয়া আর রান্নার লোক রেখেছি। সংসারও ওদের টাকাতেই চিরকাল চলেছে। টিউশন করত। কোচিং-এ পড়াত। আরও কত কী করত—কে জানে! বলে চুপ করে রইলেন দুগ্গা মেসোমশাই। আমরা পুকুরধারের সরু গলি পার হয়ে আরও সরু গলি ধরেছি মেসোমশাইয়ের বাড়ি পৌঁছনোর জন্য। আবার বললেন, ওরাই চালাত, নিজেদের পড়ার খরচ। যা কিছু। আমি কিছু দিতে পারিনি। বোনেদের পড়ার খরচ। মায়ের ওষুধপত্র। সব। ওই বড় দুই বোন। আর সেজো, এখন পাঠায়।

গান লেখেন এখন, মেসোমশাই?

লিখি। মাঝে-মাঝে। রেডিও-য় আর যাওয়া হয় না। লিখে খাতায় রেখে দিই। নিয়ে আর যাই না। কী হবে বলো নিয়ে গিয়ে। গানটা দিয়ে এলাম। কেউ গাইতে রাজি হল না। অফিস থেকে আমাকে বলে আবার পঁচিশটা গান জমা দিন। ওরা দেখতে চায় আমার গান এখন চলবে কি না। এ বয়সে আর গান লেখার কী পরীক্ষা দেব বলো ছেলেছোকরাদের কাছে? আহা, একটু আস্তে হাঁটো। আস্তে।

অজান্তেই আমার হাঁটার গতি বেড়ে গিয়েছিল। আমি থমকে দাঁড়ালাম। দুগ্গা মেসোমশাই বলিরেখাঙ্কিত মুখ নিয়ে মধুর হাসলেন। এই ফুলগুলো নিয়ে যাচ্ছি। চূর্ণীর ধারে ফুটেছিল। এক মাঝিকে একটা টাকা দিতে পেড়ে দিল। আস্তে আস্তে হাঁটছি। জোরে হাঁটলে পাছে ঝরে যায় পাপড়িগুলো! তোমার মাসিমার ঘরে নিয়ে গিয়ে সাজিয়ে রাখব। ডালগুলো পুঁতব উঠোনে। যদি হয়। তোমার মাসিমা তো খুব ফুল ভালবাসতেন। মানে মাথাটা যখন ঠিক ছিল। তারপর তো ছেলেটা মারা যাওয়ার পর থেকে মাথাটা নষ্ট হল।

ছেলে? ছেলে কোথা থেকে এল? আমি অবাক। ওঁর তো সব মেয়েই? তা হলে? আজ আবার অনেকদিন পর দুগ্গা মেসোমশাইদের বাড়ির সামনে এসে পৌঁছেছি। বেড়া-গেটের ওপরে হাত রেখে কথা বলছেন দুগ্গা মেসোমশাই। গেটের ওপর দিয়ে দেখি উঠোনে যে জায়গাটা ঝোপ হয়ে থাকত সেখানে বেশ একটা বাগান মতো হয়েছে।

ভারি সুন্দর বাগানটা করেছেন তো মেসোমশাই! আবার হাসলেন। বাগান তো অনেকদিন হত এ বাড়িতে। তোমার মাসিমাই করতেন। খুব ফুল ফুটত। গাঁদায় গাঁদা, ডালিয়ায় ডালিয়া হয়ে থাকত একেবারে সারা বাগান! বেলকুঁড়ি হত। গন্ধরাজের গাছ ছিল। বাচ্চারা তার মধ্যে খেলে বেড়াত। দেবী, বেবি আর ওদের ভাই।

আমি এবার আর থাকতে পারলাম না। ভাই? দেবীদি, বেবিদি-র ভাই? কখনও দেখিনি তো!

হ্যাঁ, আমার ছেলে। বেবির পরেই। মশার আগে। ওই তিনটেই বাচ্চা আমাদের ছিল তখন। তোমার মাসিমা পুজো দিতে মন্দিরে গেল নীলষষ্ঠীর দিন, লম্বা লাইন ছিল মন্দিরে। ছেলে তখন চার বছরের। বাড়িতে রান্নার মেয়েটার কাছে রেখে গিয়েছিল। সে ওকে একা রেখে চান করতে ঢুকে যায়। আর ছেলেটা কুয়োয় পড়ে গেল, ইঁদারার ধারে উঠে হাঁটছিল। ওই খেলাটা খুব পছন্দ করত কিনা।

আমার শ্বাস আটকে এল। সে কী!

দুগ্গা মেসোমশাই বললেন, তোমার মাসিমা এলেন যখন পাড়ার লোক জড়ো হয়ে গিয়েছে। উনি ঝুঁকে দেখলেন মুখটা ভাসছে। যখন তোলা হল হাত দু'টো মুঠো করা ছিল। সেই থেকেই তো! চলো ভিতরে চলো।

ভিতরে বারান্দায় বসে রইলাম। পাপড়িগুলো সব ফুল থেকে আলাদা করে করে এক-একটা কাচের প্লেটে রাখতে লাগলেন দুগ্গা মেসোমশাই। জল দিলেন একটু-একটু করে আর বলতে লাগলেন, তারপর থেকে রোজ রাত্তিরে তোমার মাসিমা আমার কাছে আসতেন। আর বলতেন, এবার আর একটা ছেলে দাও। গুলু ফিরে আসবে। জোর করতেন। উনি বলতেন। আমিও চেষ্টা করে যেতাম। পরপর চারবার। মেয়ে হল। মাথাটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। ও রাত্তিরবেলা জেগে থাকত। টর্চ জ্বেলে দেখত কুয়োর মধ্যে মুখটা ভাসছে কি না। তখনই মা'র রোগটা প্রথম বুঝতে পারে বড়মেয়ে।

উঠে পড়লেন দুগ্গা মেসোমশাই। যাই, এই প্লেটগুলো ওর ঘরে রেখে আসিগে।

এর কিছুদিন পরে শুনি বাথরুমে পড়ে গিয়ে কোমর ভেঙে শয্যা নিয়েছেন দুগ্গা মেসোমশাই। উঠতে পারেন না। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। হাসপাতাল থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে। এ বয়সে অপারেশন করানো যাবে না। তিন মেয়ে নিয়মিত আসছে প্রতি হপ্তায়। নার্স রাখা হয়েছে। আমি আর যাইনি। শুনলাম বেডসোর দেখা গিয়েছে।

দুগ্গা মেসোমশাই আর তাঁর স্ত্রী চার-পাঁচদিনের ব্যবধানে মারা যান। পরপর তিনটে ঘর পাশাপাশি। তৃতীয় ঘরটায় ঘরে রাখা ছিল মাসিমাকে। আর প্রথম ঘরটিতে ছিলেন দুগ্গা মেসোমশাই। মাসিমাকে নিয়ে যমে-মানুষে চলছে তখন। উত্থানশক্তিরহিত দুগ্গা মেসোমশাই মাঝে মাঝে সাড়া নিতেন—কী হল। বীণা। ও বীণা! মরে যাওনি তো! ও বীণা! এত লোক কেন বাড়িতে।

যখন মাসিমার মৃতদেহ উঠোন পার করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, মেয়েরা চোখের জল লুকিয়ে বাবার কাছে এসে বলছে, তুমি মিথ্যে ভাবছ। মা তো ঠিকই আছে। শবযাত্রীদের বেবিদি নিষেধ করে দেয়, হরিধ্বনি এখানে দেবেন না। বড় রাস্তায় ওঠার পর দেবেন। বাহকরা যখন বডি কাঁধে তুলছে উঠোনে, বেরিয়ে যাচ্ছে, তখনও তারা দুগ্গা মেসোমশাইয়ের ডাক শুনতে পাচ্ছিল : ও বীণা। বীণা। তুমি মরে যাওনি তো! মরে যেও না যেন। আমি তো আছি বীণা। আমি তো আছি। তোমাকে আবার ছেলে দেব বীণা। তোমাকে আবার একটা ছেলে দেব। একটু সুস্থ হই।

সেই সপ্তাহেই যে দুগ্গা মেসোমশাই মারা যান সে-কথা তো বলেইছি। আমার শুধু এখনও মাঝে-মাঝে মনে হয় অনেক অনেক হলুদরঙা ফুলভরতি গাছের ডাল হাতে বিকেলের রোদ্দুরে দাঁড়ানো দুগ্গা মেসোমশাইয়ের রেখাকুঞ্চিত মুখের হাসি। তোমার মাসিমার জন্য নিয়ে যাচ্ছি। ভাল না ফুলগুলো?

সেই সঙ্গে মনে পড়ে ঘনায়মান সন্ধ্যার অন্ধকারে আলিসাহীন বিরাট ছাদের প্রান্তে দাঁড়ানো সেই উন্মাদিনীর স্বর : কুয়োর জলে ভেসে উঠেছে...মরা মুখ দেখা যাচ্ছে...

চেনা, আধচেনা মানুষের মুখ, মুখের মিছিল

আব্‌রিত্‌তি লিখঅস? আব্‌রিত্‌তি? অ্যাঁয়? বাংলার মাস্টার মিত্‌তুনজয় বাবু কইছিল? কী লিখঅস? আব্‌রিত্‌তি?

না, স্যর।

আবার মিসা কথা কয়! থাবড়া খাবি-ই? থাবড়া-আ?

না স্যর।

তবে মিসা কথা কস ক্যান? দুই পৃষ্ঠা, তিন পৃষ্ঠা কইরা আব্‌রিতি লেইখ্যা কিনা রেগুলার জমা দিস বাংলার মাস্টাররে? বলিস কিনা কারেকশঅন কইরা রাইখবেন! অ্যাঁয়?

না স্যর দু'বার দিয়েছিলাম।

তবে 'না, স্যর' কস ক্যান? 'হাঁ স্যর' ক।

এঁর নাম মুশকো স্যর। মুশকো স্যরের খুব রাগ কেউ কবিতা লিখলে। উনি অংকের শিক্ষক। অনন্ত মণ্ডল। ক্লাসেই বলেন, জোর গলায় : রুবি ঠাকুর কী কঅরছিল? না, আব্‌রিত্‌তি ল্যাখসিল। শন্‌সোয়িতা-খান ভইরা-বইরা আব্‌রিত্‌তি ল্যাইখ্যা এক্কেরে শ্যাষ কইরা রাখছিল। বিবাহে একখান শন্‌সোয়িতা পাইছিলেন আমার ইস্তিরি। ইনি দ্যাহ রাখছেন কবেই। শুদ্ধু বইখান আসে এহন। কুন কামে লাগে? বাড়িতে রাইতে চুর আইলে, গ্যারোস্তো হাতের কাছে কিছু না-পাইলে, ওইখান ছুঁইড়া মারা ছাড়া আর কুনো কাম অইবো না শন্‌সোয়িতা দিয়া।

ক্লাসের মধ্যে একজন বলে উঠল : কেন স্যর, রুবি ঠাকুর তো নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন?

এক্কেরে মাইরা রাখসে দ্যাশটারে তো ওইতেই। নুবেল প্রাইজ পাওনটাই কাল অইল। ক্যান, যাদব চক্‌কোত্‌তিরে কেউ একখান নুবেল প্রাইজ দ্যায় নাই ক্যান? সায়েবগুলান চিরুকাল জমিদার-চাটা। চিরুকাল-ই। যাদব চক্‌কোত্‌তি যে কত্‌তো বড় বিদ্‌দান! অ্যাঁ! উনির যে গ্রান্‌থো...গানিতের যে গ্রান্‌থো খান উনি...তা ল্যাখতে বুকের পাটা লাগে। ব্রেইন লাগে। ব্রেইন। অ্যাঁ? আব্‌রিত্‌তি ল্যাখনের মতো সহজ না। রুবিঠাকুর, অ্যাত্‌তো সব বই ল্যাখসে...নাটক, নুবেল...অর ওপর, অরে জানি কী কয়! হ, হ, প্রু-বান্‌ধো-ও...তাও ল্যাখসে...গানবাজনাও ল্যাখসে! নাইচ্‌? নাইচ্‌ও ল্যাখসে, এই যে হ্যামনলিনী বিদ্যালয়ের মাইয়ারা নাচে, নিত্‌তোনাইট্যো, হেই নাইচ্‌গুলান তো রুবি ঠাকুর-ই ল্যাখসে! অহক্‌কল-ই ল্যাইখ্যা থুইসে! শুদ্‌দু একখান অংকের বই ল্যাখে নাই! একখানাও না! ক্যান? একখানা পাটিগানিত ল্যাখ্‌তে কী অইছিল রুবি ঠাকুরের? কও? ক্যান ল্যাখে নাই? অ্যাঁয়?

কেন লেখেননি স্যর!

ব্রেইন লাগে। ব্রেইন। পারে নাই। সাইধ্যো অয় নাই। যাদব চক্‌কোত্‌তির ব্রেইন আছিল।

গালে, কপালে, চিবুকে গর্ত গর্ত দাগ। বসন্ত-র। কুচকুচে কালো গায়ের রং। ঘন ভুরু। জোড়া। বড় চ্যাটালো কান। কানে চুল। মাথায় খাড়া কদমছাঁট। সব কালো। ফতুয়া থেকে বেরিয়ে আসা পুরু হাতে গোছা গোছা লোম। ফতুয়ার গলার কাছে লোম। ধুতি হাঁটু অব্দি। পিছনে ঘুরলেন তো পায়ের দাবড়া ডিম দেখা যাবে। শীতকালে ধুতির ওপর কালো কোট। বৃষস্কন্ধ যাকে বলে, তাই। কপাটবক্ষ। হাইট, পাঁচ ফুট দশ-টশ তো হবেই। সেই পরিমাণে চওড়া। চক্ষুদ্বয় গোল ও বড়। নাসারন্ধ্র দু'টি ডানদিক-বাঁদিকে একটু করে ওঠানো। নাক সর্বসময় কুঁচকে আছে।

একদিন চিৎকার করছেন ক্লাসে—অ্যাই লইখ্যা! কী ল্যাখ্‌সো? এডা কী ল্যাখসো? বাপ-মায়ে আবার নাম রাখসে লোকখীমনতো!

ছাত্রটির নাম সত্যিই লক্ষ্মীমন্ত মজুমদার। কী-ই ল্যাখ্‌সো? 'প্রুদইত্‌তো বাসি মাল'! অ্যাঁয়!

ছাত্রটি 'প্রদত্ত রাশিমালা' লিখতে গিয়ে তাড়াহুড়োয় 'র'-এ ফুটকি আর 'ল'-এ আকারটা দিয়ে উঠতে পারেনি। ক্লাসে তার নাম-ই হয়ে গেল 'বাসি মাল'।

ওদিকে একজন কবিতা লেখার চেষ্টা করে স্কুল ম্যাগাজিনে দিয়েছে, আর বাংলা স্যর উৎসাহ দিতে তাঁকে মাঝে-মাঝে দেখাতেও গিয়েছে। জানাজানি হতে কী কাণ্ড, সে তো দেখাই গেল। কিন্তু এরপরে আরও আছে।

অংকে কত পাইছস, জানোস? উনোত্‌তিরিশ। পাস করো নাই! পাস মার্ক নাই তোমার! থাকবে কী জইন্য! কী-ই জইন্য থাকবে, শুনি? অ্যাঁ? আব্‌রিত্‌তি ছাপাইতে চাও? ম্যাথোমেইটিক্‌সে পাস মার্ক তুমারে দিমু না। দিমু-ই না আমি! আমারে মাইরা ফ্যাললেও দিমু না। গরগর করতে-করতে ক্লাস ছাড়লেন মুশকো স্যর।

ক্লাসের মধ্যেই ব্যক্তিগত কথা বলার অভ্যেস স্যরের।

অ্যাই যে আমি। ছুটো থেকেই শুনছি রুবিঠাকুর-রুবিঠাকুর! জিব্বা থেকে লাল-ঝুল ফেইল্যা দ্যায় লুকজনে, রুবিঠাকুরের নাম কইরা। আমি কখুনো পইড়াও দেখি নাই। কখুনো না। রুবিঠাকুর না-পইড়াই আমার ষাইট বৎসর বয়স পুন্নো অইল। ইস্কুল কমিটি আমারে এক্সটেইনশন দিসে আরও দুই বৎসরের জইন্য। আমারে অশিক্ষিত কইতে পারবা? কও? অশিক্ষিত অইলে ইস্কুল কমিটি কি আমারে এক্সটেইনশন দিত? অ্যাঁ!

অ্যাই যে আমার বড়ুছেলে! সে মেজবাবু অইসে থানায়। সে গ্রাজুয়েট। গ্রাজ-উ-য়ে-এট। বুঝলা! সে-ও কখুনও কুনো রুবিঠাকুরের আব্‌রিত্‌তি পড়ে নাই। ইস্কুলের সিলেবাসে যা আছিল, তা ছাড়া পড়ে নাই। ভিলেজে অহক্কলে তারে মানে। মানে থানার বড়বাবুও। চুর-ডাকাতে মানে। অনেক উপরি পায়। অ-নে-ক। রুবিঠাকুরের আব্‌রিত্‌তি না-পইড়াই আমাদের কুনো অভাব নাই। আমার বড়ছেলে আইজ মেজবাবু। তারে কেউ অশিক্ষিত কইতে পারবা! কও? অ্যাঁ?

কে কী বলবে? মানে কইবে? বলা-কওয়ার আর কী আছে? মুশকো স্যর যেমন বেচারা লক্ষ্মীমন্ত মজুমদারের নাম 'বাসি মাল' করে দিয়েছিলেন, তেমনই ক্লাসের ছাত্ররাও মুশকো স্যরকে ছাড়েনি। এমনিতেই বলত 'মুশকো স্যর'। আড়ালে। সেই নামটা হঠাৎ আড়ালেই বদলে গেল।

যে-ছাত্রটি পৃষ্ঠা-পৃষ্ঠা লেখা প্র্যাকটিস করত সে ছিল নিরীহ ধরনের বদমাইশ। মিনমিনে শয়তান যাকে বলে। তার স্বভাব ছিল ডিকশনারি ঘাঁটা। আর জুৎসই ওয়ার্ড-এর সন্ধান করা। সে একদিন বাড়ি থেকে ডিকশনারি বগলদাবা করে স্কুলে এল। তখন সবে ইলেভেন-এ উঠেছে তারা। ডিকশনারি খুলে দেখাল ছেলেপুলেকে। দেখ, মুশকো স্যর বলি তো আমরা? মুশকো মানে কী সেটা দ্যাখ!

ছেলেপুলের একটু সময় লাগল বুঝতে। বুঝেই হইহল্লা জুড়ল সব। ম্যাচ জেতানো প্লেয়ারের মতো, ওই নিরীহ বদমাইশটাকে, কাঁধে তোলে আর কী!

টিফিনে, গাছতলায় বসে, ডিকশনারি খুলে, নিরীহ বদমাইশটা ওদের দেখিয়ে দিল 'মুষ্ক' বলে একটা ওয়ার্ড আছে। সেটার মানে অণ্ডকোষ। বানানটা শুধু 'তালব্য শ' দিয়ে নয়। 'মূর্ধন্য ষ' দিয়ে। আর যুক্তাক্ষর।

সমস্ত ইস্কুলে রটে গেল বি-স্যর। বি-স্যর। ওই যে 'বি' আসছে। মানে বিচি স্যর। সংক্ষেপে বি। বিচি-র ক্লাস আছে। সত্যিকারের ভালমানুষ লক্ষ্মীমন্ত মজুমদার প্রতিশোধের আনন্দে মৃদু হাসে আর মিনমিনে শয়তানটাকে ডেকে-ডেকে চালতার আচার খাওয়ায়। এক্সট্রা হজমিগুলি দিয়ে দেয় বুকপকেটে। লক্ষ্মীমন্ত মজুমদারের মুখ প্রতিশোধের আলোয় স্নিগ্ধ হয়ে থাকে।

মুশকো স্যর আরও কিছুকাল এক্সটেনশনে থেকে রিটায়ার করলেন। কিন্তু দাপট কমল না, বরং বাড়ল। কারণ মুশকো স্যরের বড়ছেলের দাপট বাড়ল। মুশকো স্যরের বড়ছেলে আগে মেজবাবু ছিল কোন গ্রামে—এখন প্রোমোশন পেয়ে বর্ডারের দিকে আছে। বড়ছেলে অনেকদিন আগেই বড়বাবু হয়েছে। এ বাড়িকে বড় দারোগার বাড়িও বলে এখন লোকে।

বড় ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন মুশকো স্যর। একটা ছেলেও হয়েছে। তারপর একদিন দোতলার ঘর থেকে নিচু রেলিং-এর বারান্দায় ছুটে এল বউটা। মুখে বলছে, আর না আর না। পিছন পিছন বেল্ট হাতে ইউনিফর্ম পরা বড় দারোগা। বেল্ট পড়ছে পিঠে-মুখে। বউটা, টাল রাখতে না-পেরে নিচু রেলিং-এ আছড়ে পড়েই বেকায়দায় ঘুরে সটান নীচের উঠোনে। টিউকলে কোমরটা লাগল, মাথাটা উল্টো হয়ে ধাক্কা দিল কলের নীচে সিমেন্ট বাঁধানো চাতালে। ব্যস! ওখানেই শেষ। ছেলেটা তখন বছর সাতেকের। উঠোন-সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে দেখছে মা পড়ল।

কিচ্ছু হল না। বউটার বাবা-মা-দাদা এসে বড় দারোগার উঠোনে দু'দিন কান্নাকাটি করে পথ দেখল। কী আবার হবে? থানার বড় দারোগা। গাঁয়ের গরিব মেয়ে বিয়ে করে এনেছিল।

পরের বারও তাই আনল। মেয়েটা এবার আরও গরিব। বয়স আরও কম, মাত্র ১৮। ৯ বছরের ছেলেটাকে পাঠিয়ে দিল বোর্ডিং ইস্কুলে। ছুটিতেও ছেলেটাকে বাড়ি আনে না। নতুন বউটাকে শুধু পুজোবাড়ি যেতে দেখা যায় মাঝে-মাঝে।

মুশকো স্যরের ছোট পুত্র আগেই বাবা-দাদার অমতে রেজিস্ট্রি করে সস্ত্রীক বাড়ি ঢুকেছিল। মুশকো স্যরের তর্জন চলছে। নিচু পাঁচিলের ওপারটায় উকিঝুঁকিতে পাড়ার মা-কাকি-জেঠিরা। উঠোনে নতমুখী নবপরিণীতা। এ সময় বড় দারোগা বেরিয়ে এসে এক থাপ্পড় ভাইকে। ভাই ঘুরে মাটিতে। নতুন বউ ঝুঁকে পড়ে তুলল। তুলে সেই যে স্বামীকে নিয়ে বিদেয় হল, আর এ-টাউনে ঢোকে না। মুশকো স্যর গর্বের সঙ্গে বলেন, তাড়িয়ে দিয়েছেন ছোট ছেলেকে।

কোথায় বলেন? প্রধানত টিউশন ছাত্রদের। বাড়িতে মাদুর পেতে দু'বেলা টিউশনি করা আর দু'বেলা টানা এক মাইল হাঁটা চালিয়ে যাচ্ছেন মুশকো স্যর।

শোনা যায়, ছোট ছেলের বউ শিক্ষিত, হাইস্কুলে পড়ায়, ডানকুনি না কোথায় যেন। তার বর সেখান থেকে চাকরিতে যায় ডালহৌসিতে। ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে। টাউনের লোকের সঙ্গে দেখা হলে বাড়ির কথা তোলে না। কেউ বললেও শুনতে চায় না।

বড় দারোগার ছেলেটা একেবারে পাঁচ বছর পর এল। পাড়ার লোক অবাক। বছর ১৪ বয়স ছেলেটার, লম্বা-চওড়ায় প্রায় বাবার সমান, এখনই! এ-বাড়ির পুরুষরা উঠোনের টিউকলে চান করে। ছেলেটা কী জানি কেন চান করতে নদীতে যায় রোজ। বড় দারোগা যদি বাড়ি থাকে, ধমকায়, তা হলে চান না করে রুক্ষ মাথায় খেতে বসে যায় ছেলেটা। একদিন দেখা গেল, বাড়ির সামনের টাইম কলে একটা গেলাস নিয়ে ঢকঢক দু'গেলাস জল খেল। অন্য যারা জল নিতে এসেছে তারা অবাক। ধুয়ে নিয়ে, কাঁসার গেলাস থেকে হাতের ঝাঁকিতে জল ঝরাতে-ঝরাতে ঢুকে গেল সদর দিয়ে।

দিন সাতেকের মধ্যে বোর্ডিং-এ ফেরত। আবার আসে না আসে না। দু'বছর। তারপর এল। চান করতে নদীতে যায়। কী তাগড়া! বছর ষোলো বয়স হবে। মাথাটা বড়। এ-বাড়ির ধারা। সব কিছু বাবা আর ঠাকুরদার মতো। শুধু গায়ের রংটা মায়ের। ফলে, তাকিয়ে দেখতেই হয়।

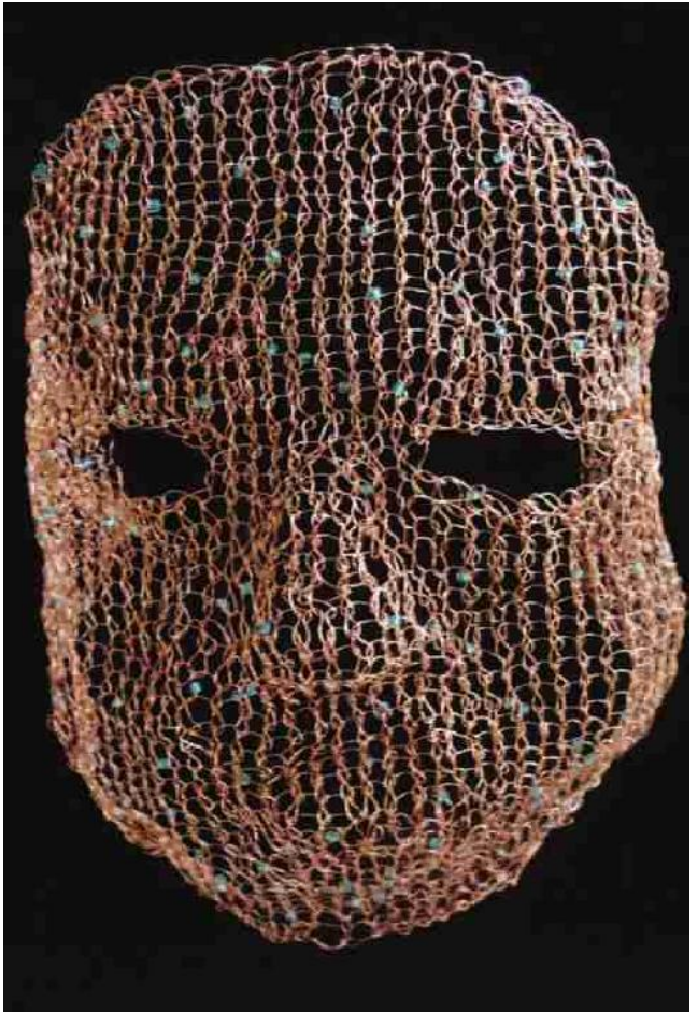

ছেলেটা কারও সঙ্গে কথাবার্তা বিশেষ বলেই না। কেউ কিছু জিগ্যেস করলে হুঁ-হাঁ করে উত্তর দেয়। এখন রাস্তার কল থেকে এক বালতি করে জল নেয় রোজ। টাইম কলে জল আসে সকাল-দুপুর-বিকেল-সন্ধ্যায়, নিয়ম করে। মিউনিসিপ্যালিটি-র কল। জড়ো হওয়া বউ-ঝি'দের মাঝখানে এসে ছেলেটা তার বিরাট চেহারা নিয়ে দাঁড়ায়। হাতে একটা প্লাস্টিকের নীল বালতি। তখনই বাকি সবার কথা বন্ধ। তাড়াতাড়ি নিজের বালতি বা ঘড়া সরিয়ে ছেলেটাকে জল নিতে দেয় সকলে। বড় দারোগার বাড়িতে প্লাস্টিকের বালতি ব্যবহার হয় না। কেউ-কেউ রেলবাজারে তাকে দেখেছে। ট্রেন থেকে নামার পর, হাতের সুটকেস রিকশায় উঠিয়ে প্লাস্টিকের মগ-বালতির দোকানের সামনে ছেলেটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে।

ছেলেটার দাঁড়িয়ে থাকাটা অদ্ভুত! স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অত মহিলার মাঝখানে। অথবা একা। একটা পাহাড়ের মতো। মাথাটা ভারী। চোখে যেন দৃষ্টি নেই। একটা বড় পাথর পড়ে আছে যেন।

একদিন ছেলেটা নদী থেকে চান করে সদর দরজায় ফিরেছে। তখন নিচু পাঁচিলের বাইরে জিপ। ভিতরে চেঁচামেচি।

বড় দারোগা চেঁচাচ্ছে—তুই বাইরের ছাড়া-কলে জল আনতে গিয়েছিলি ক্যান?

দ্বিতীয় বউয়ের ক্ষীণ গলা, তবুও শোনা যাচ্ছে এখন—লাগছে, আহ্—লাগছে—মা গো।

ক্যান গেছিলি ক!

দ্বিতীয় বউয়ের গলা, রাজু এসে খেতে বসবে। খাওয়ার পর জল খাবে, তাই। আহ্, ছাড়ো।

বড় দারোগার গলা, জল খাইব? মানে? মানে কী? টিউকল রইসে তো। বাড়ির বউ জল আনতে বাইরে যাবি?

রাজু, ছাড়া-কলের জল খায়। এই জল খেতে পারে না। নিজেই আনে। আজ দেখি ওর ঘরে বালতিতে জল নেই। ভুলে

গিয়েছে। রাজু ফিরতে-ফিরতে যদি জলের টাইম হয়ে যায়, জল চলে যায়—এই ভেবে এনে রেখেছিলাম।

বড় দারোগার গর্জন, এই টিউকলের জল রাজুর বাবা-য় খায়, ঠাকুরদা-য় খায়। রাজুরও খাইতে হইব। রাজু খাইতে বাইধ্য। ফ্যাল বলছি! ফ্যাল। বালতির জল ঢাইল্যা ফ্যাল। আমার চোক্ষের সামনে ফ্যালবি ওই জল।

ছেলে উঠোনে ঢুকে চুপচাপ দাড়িয়ে। দেখছে, বড় দারোগা একহাতে জল-ভরা প্লাস্টিকের বালতি আর অন্য হাতে তার দ্বিতীয় বউয়ের লম্বা চুলের গোছা মুঠো করে টানতে-টানতে বারান্দা পার হচ্ছে। ফ্যাল।

ছেলে এগিয়ে এল। দিন। আমি ফেলে দিচ্ছি। বড় দারোগার হাত থেকে শান্তভাবে বালতি নিয়ে উঠোনের সামনের নালায় ঢেলে দিল ছেলে। স্বামীর হাত থেকে চুলের গোছা ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে রান্নাঘরে ঢুকে গেল দ্বিতীয় বউ।

ছেলে এরপর আরও তিনদিন ছিল। জল খায়নি। বাড়ির কাজের লোকের কাছে পড়শিরা শুনল। তিনজন ঠিকে মেয়েলোক ও-বাড়িতে কাজ করে।

ছেলের আসা আরও কমে গেল এরপর। হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে একবার এল দু'দিনের জন্য। চলে গেল আবার। কোন কলেজে যেন পড়ছে। পড়াশোনার ক্ষতি হবে বলে বাড়ি আসে না। মেসে থাকে। তার ঠাকুরদাই বলেন এ-সব পাড়াপড়শিদের।

বড় দারোগার বাড়িতে সারাদিন এমনিতে আওয়াজ নেই। ঠান্ডা, চুপচাপ। দ্বিতীয় বউয়ের সন্তান হয়নি তো! শ্বশুর বলেন, বউমা বাঁজা। পাড়ার অন্য বুড়োদের কাছে বলেন। বড় দারোগার চিৎকারও শোনে পড়শিরা—অ্যাই বাঁজা মাগি! ইদিকে আয়।

পাড়ার লোক বলাবলি করে এই বাড়িতে তো কোনও বউ বাঁচে না, এই বউটা টিকে গেল কী করে কে জানে?

আগে কলবল করে স্টুডেন্টরা আসত দুবেলা। এখন অনেকদিন মুশকো স্যরের টিউশনি বন্ধ। বাড়ির সামনের জঙ্গুলে গাছপালা নিজে-নিজে কাটছিলেন মুশকো স্যর। কী একটা গাছের রস চোখে ছিটকে লাগে। তারপর থেকে চোখ খারাপ। অপারেশন। দু'বার। তাও সারেনি। এক চোখে পুরু কাচ। অন্য চোখ কালো দিয়ে ঢাকা। বেশি চলাফেরা করতে পারেন না। তার ওপর সুগার ধরা পড়ল। রোয়াকে বসে থাকেন। সদর দরজার বাইরে। রাস্তা দিয়ে যাওয়া-আসা করা কাউকেই জানাতে ভোলেন না, তিনি গ্র্যাজুয়েট। তাঁর ছেলে গ্র্যাজুয়েট। এখন তাঁর নাতিও গ্রাজুয়েট হয়ে গিয়েছে।

নাতির কাকাও তাই। কিন্তু মুশকো স্যর ছোট পুত্রের নাম মুখে আনবেন না।

নাতি নাকি আর্মিতে চান্স পেয়েছে। নিজের চেষ্টায়। বিজ্ঞাপন দেখে। এখন অনেকদিন ট্রেনিং-এ আছে। তাই বাড়ি আসতে পারে না।

বাড়ি অবশ্য এল। বড় দারোগার অ্যাকসিডেন্টের খবর পেয়ে। বড় দারোগার এক মেয়েমানুষ রাখা ছিল। তার বাড়ি থেকে অনেক রাতে ফেরার সময় বর্ষার রাস্তায় পিছলে গিয়ে বড় দারোগার জিপ গাছে মারে ও তৎক্ষণাৎ উল্টে পাশের পুকুরে অর্ধেক ডুবে যায়। ড্রাইভার মৃত। বড় দারোগার প্রাণ বেঁচে গিয়েছে। কোমরের হাড় তিন টুকরো। তারপর? হাসপাতাল-বাড়ি-হাসপাতাল। শেষমেশ আবার বাড়ি। বড় দারোগা শয্যায়।

বড় দারোগার ছেলে এবার আসতে লাগল। এসে থাকতেও লাগল। মাঝে-মাঝেই। বড় দারোগার অবস্থা কী?

বড় দারোগার অবস্থা কিছুকাল একইরকম। ক্রমশ অধিক-অধিকতর খারাপ।

নিরীহ বদমাইশটাও এখন কলকাতা শহরেই থাকে। মাঝে-মাঝে দেশের বাড়ি আসে। একদিন ওই পাড়া দিয়ে যেতে-যেতে দেখল মুশকো স্যর বসে আছেন, রোয়াকে। পাশেই বড় সদর দরজা খোলা। ভিতরে উঠোন। পায়রা ঘুরছে।

প্রণাম করল। চিনতে পারলেন না। ছাত্তরও তো সেই ইস্কুলেরটি নেই। সেও মাঝবয়সি হল। কিন্তু নাম বলতে চিনলেন। তুমার নাম তো আইজকাল প্যাপারে বারঅয়। পাড়ার লুকেও বলে। টিভিতেও দ্যাখায় তুমায়, শুনসি। আমার টিভি দ্যাখা নিষেধ আছে। চুখের জইন্য।

হঠাৎ হাত বাড়িয়ে কবজিটা ধরলেন। তুমি তো বাবা অহন গইন্যমাইন্য অইসো। আমার দু'টা কথা শুনবা?

হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন স্যর।

বইস্যা শুনতে হইব কিন্তু। আমার পাশে বইসো। এই রুয়াকে। মাদুর না-ই কিন্তু। আমি অমনিই বইসা পড়ি।

নিরীহ দেখতে ছাত্রটি বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে আগের চেয়েও মতলববাজ (অভিসন্ধিপ্রবণ?) হয়েছে। এই বৃদ্ধ তার কাছে একটা সাবজেক্ট। সে বসে পড়ল।

বলুন না স্যর, কী বলবেন?

আমার বড়ু ছেলের তো উঠনের ক্ষ্যামতা নাই।

জানি স্যর। জিপ অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল।

ওঃ। তুমি জানো? অ্যাঁয়?

জানি স্যর, বাড়িতে তো আসি। টাউনের লোকেও মাঝে-মাঝে যায় আমার কাছে। খবর পাই।

আমার চুখটা—

জানি। গাছ কাটতে গিয়ে।

ডুমুর গাছ অইছিল। দা-ও দিয়া ডালগুলান কাটছিলাম। আঠা ছিটকাইয়া পঅড়লঅ...

আপনার ছোট ছেলে কেমন আছে স্যর?

জানি না। বড়ুর অ্যাকসিডেইন্টের পরেও ছুটো আসে নাই। বৌমাডা বদ। আসতে দ্যায় না। দুইডা কইন্যা উদের। চুক্ষেও দেখি নাই। উদের মা-র নাকি কইয়া দিছে, ওই বাড়িতে কুনো মাইয়ার পা দেওন-ই উচিত না। কও! কী কইবা অ্যাঁ?

তখন বিকেল সাড়ে তিনটে। অঘ্রাণের শুরু। রোদ হেলে গিয়েছে তাড়াতাড়ি। মুশকো স্যরকে এখন আর মুশকো বলা যায় না। সুগারের আক্রমণে দশাসই চেহারাটা কুঁকড়ে গিয়েছে। মাথাটা ন্যাড়া করে রাখেন। কালো একটা লোহার শিকের মতো লাগে দাঁড়ালে। একটু বেঁকে যাওয়া শিক। একটা হাফ সোয়েটার। ফতুয়াটা ঠিকই আছে। ফতুয়ার হাতা থেকে সরু হয়ে যাওয়া হাত বেরিয়ে কোলের ওপর রাখা। সাদা হয়ে গিয়েছে হাতের লোম।

তুমারে একটা কথা কই। শুধু ছুটো বউমা-ই নয়। নাতিডাও কী কয় জানো! আসে। থাকে। টাইম কলের জল খায়। বাড়িতে টিউকল। দ্যাখ্‌সো তো। কবে থিকা...

ছাত্তর ঘাড় ঘুরিয়ে দ্যাখে। টিউবওয়েল, উঠোন প্রান্তে। পায়রা উড়ে বসছে তার ওপর।

নাতি কয়, মায়ের হাড়িকাট-ধুয়া জল খাইমু না। অর মা-য়, উই দু'তলার বারাইন্দা থিকা নলকূপের ওপরই পঅড়ছিল তো। হ্যাই নলকূপ তো না-ই! না-ই আর। না-ই। অইন্য কল বসানো অইসে। তাও কইব হাড়িকাট। কও দেখি!

ছাত্তর চুপ। সামনের রাস্তা দিয়ে একটা সাইকেল যাচ্ছে। দু'টো লোক যাচ্ছে। মুশকো স্যর চুপ করে যাচ্ছেন।

হঠাৎ মুখটা কাছিয়ে এনে ফিসফিস করেন, নাতিটা আসে। থাকে। বউমা আর নাতি একোই ঘরে শুইতে যায়। বড় ছেলে শুজ্জাশাই-ই। তাও বুঝে। সব বুঝে। কয়, বাবা আপনে নজর করবেন উয়াদের।

ছাত্তরটি যত আশ্চর্য। তত উৎসুক। সাবজেক্ট, সাবজেক্ট। মুখে বলে, বলেন কী স্যর? তারপর? নজর করেন, আপনি?

আবার সামনে দিয়ে লোক যাচ্ছে। মুশকো স্যর চুপ। ছাত্তরটিকে কেউ জিগ্যেস করছে, আরে তুমি, কবে এলে?

কাল এসেছি।

ক'দিন থাকছ!

সকালে চলে যাব।

এইসব চলছে।

মুশকো স্যর কাপড় দিয়ে ঢাকা হাঁটুর ওপর একটা মশা মারতে থাপড় ফ্যালেন। স্প্রে কইরা মাইরতে অইবে উয়াদের! ছাত্তর চমকে ওঠে, কাদের?

অ্যাই মশাগুলার কথা কইছি। ধুতি সরিয়ে মুশকো স্যর শুকনো কালো হাঁটু বার করে দেখার চেষ্টা করেন মশাটা মরল কি না। মরেনি। পালিয়েছে। এই মশাগুলান অইসে শুয়ারের বাচ্চা। ধুতির ওপর দিয়া রক্তু খায়।

পুরনো প্রসঙ্গে ফেরেন এরপরই। কী কইরা নজর করুম? অহইনধ্যার পর তো চুখে কিছু দেহি না। আমি অহন রাইতকানা অইসি। তবে কানে আউয়াজ আসে। রাইতে তো ঘুমাইতে পারি না। এমনি-ই বয়অসে ঘুম কইম্যা যায়। তাই আউয়াজ পাই। কানে আইসা পড়ে।

শ্রোতা অসম্ভব উৎসুক। সাবজেক্ট! কী কানে আসে স্যর?

আউয়াজ। আউয়াজ। নানা প্রুকারের আউয়াজ অইতে থাকে বউমার ঘরে। মাইন্‌সের আউয়াজ। ঠিক কইরা কইলে মাইয়ালোকের আউয়াজ। আউয়াজ যে এমুন অয়, কুনোদিন জানি নাই।

শ্রোতার আগ্রহ শেষ সীমায়। কী আউয়াজ স্যর? কী আউয়াজ?

তুমারে বুঝাইতে পারুম না। নিজেও বুঝি না সব। আগে ফিসফিস করত। চাপা-চাপা আউয়াজ। অহন জুরেই হয়। গুঙ্গাইয়া-গুঙ্গাইয়া য্যান কাঁন্দে কেউ। মাইয়ালুকের গুঙ্গানি। একদিন ভুরবেলা উই আউয়াজ। আলো ফুটছে। লাঠি লইয়া বারইলাম ঘর থিকা। বউমার জানলায় উঁকি দিছি। ভুরের আলোয় দেহি, একোই খাইটে, একোই ল্যাপের তলে, দু'জনায়। আর ল্যাপ নড়তাসে। কী বঅলব তুমারে! এক্কেরে গাঙ্গে বানের সুময় য্যমুন ঢেউ দ্যায়, ত্যামুন ঢেউ উঠত্যাসে,...ল্যাপে...ধরো গিয়া এত্তোডাই নড়াচড়া। আর গুঙ্গানি।

সদর দরজায় কারও পায়ের শব্দ। বাবা।

ছাত্তর ফিরে তাকাল। মহিলাও তাকাল ছাত্তরের দিকে। মহিলার হাতে ছোট প্লেটে বসানো চায়ের গেলাস। তাতে দু'টো নোনতা বিস্কুট। আপনার চা, বাবা।

মুশকো স্যর ব্যস্ত হন। দ্যাও বউমা। দ্যাও। এরে চিনো? আমার ছাত্তর। প্যাপারে নাম উঠে। ছুবিও দ্যায়।

মহিলা ঘোমটা একটু টানে-কি-টানে না। স্মিতমুখে বলে, চিনি। এখানকার মানুষ। আপনার বই দেখেছি রাণী মা টকিজে।

মুশকো স্যর বলেন, হ, হ। সিনেমাও ল্যাখসো শুনছি। অরে চা দাও বউমা।

এবার শ্রোতা ব্যস্ত। না, না, আমি চা একেবারে খাই না।

অম্লান মিথ্যে। মহিলারও কোনও গরজ নেই। ও আচ্ছা, খান না বুঝি! বলে ঘুরে চলে যেতে থাকে মহিলা।

ছাত্তরের নিচু নজর। এক্ষুনি এত সব শুনেছে। সে লক্ষ করে। বয়স? তার চেয়ে বছর পাঁচেকের ছোটই হবে। বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ। তা-ই হওয়া উচিত। বিয়ে হয়েছিল কবে? ছাত্তর মনে-মনে হিসেব করে। তারপর সিদ্ধান্তে পৌঁছয়।

হ্যাঁ। ধরে রেখেছে। ধরে রেখেছে বটে।

হঠাৎ ঘুরে আসে মহিলাটি। বাবা, চা খাওয়া হলেই কিন্তু ঘরে চলে আসবেন। বাইরে মশা। আর ঠান্ডাও পড়ছে।

এরপর মহিলাটি তাকায় ছাত্তরের দিকে। এত সোজা তাকায় তার চোখে, যে, ছাত্তর অস্বস্তি বোধ করে। কেন অস্বস্তি? কারণ মহিলার চোখ বলছে : আমার শ্বশুর এতক্ষণে আমার সম্পর্কে সবই জানিয়ে দিয়েছে, সে-কথা আমি জানি।

আর মহিলার কণ্ঠস্বর বলছে : রোদ পড়ে গেলে বাবা তো কিচ্ছু দেখতে পান না। তাই আগে-আগেই ঘরে চলে আসতে বলি।

মহিলা চলে যেতে থাকে। দর্শকের নিচু নজর। সে আবার যাওয়াটা লক্ষ করে। শাঁখা-সিঁদুর, অথবা অন্য কোনও বিবাহচিহ্ন ধারণ না-করলেও, এই দর্শক জানে, কোনও কোনও নারীকে দেখে বোঝা যায় এর সদ্য বিয়ে হয়েছে, আর এ দাম্পত্যজীবনে এই মুহূর্তে সুখী। এবং সুখটা নতুন।

আবার, কোনও সদ্য-বিধবাকে আগে না-চিনলেও তেমনই ধরা যায় এ বিধবা হয়েছে—কারণ, সেই নারীর মুখে একটা ছাপ পড়ে থাকে। একটা ছায়া। সব ধর্মের, সব সম্প্রদায়ের নারী—সদ্য বৈধব্য এলে—এক। ট্রেনে যেতে-যেতে উল্টোদিকের সিটে বসা নারীকে দেখেও বোঝা যায় এর কিছু ঘটেছে সদ্যই। এই দর্শক, বুঝতে পারে। অনেক সময় মিলিয়ে দেখেছে। মিলেও গিয়েছে।

আজ এই মধ্যবয়সিনীকে দেখে, নিজের তীক্ষ্ণ ও নিচু নজর দ্বারা দর্শকের মনে হল, এ যেন নববিবাহিতা। এর শরীরে সত্যিই বানের জল খেলছে। মুখে, গালে, নতুন চিক্কন। অথচ প্রথম যখন একে দেখা যেত, মন্দিরে যেতে, নতুন বিয়ের পর, একে মনে হত—বিধবা। শাঁখা-সিঁদুর পরা বিধবা।

হঠাৎ ভিতর থেকে একটা আর্তনাদ মেশানো গর্জন শোনা গেল। অ্যা-ই, অ্যা-ই বাঁজা মাগি-ই। কুথায় গেলি। অ্যা-ই।

শ্রোতা চমকে ভিতরে তাকাল। বারান্দা ইংরেজি 'L' আকারে ঘুরে ওদিকে গিয়েছে। সেখান থেকেই আসছে গর্জনটা। মানে, বাইরের দিকের কোনও ঘর থেকে।

বাবা-আ! বাবা-আ। দ্যাখেন তো, উই খানকিটা কুথায়।

গর্জনটি ভাঙা-ভাঙা ও কাতর। শুনে বোঝা যায় গর্জনের মালিকের দাপটও এখন সম্পূর্ণ ভগ্ন, তার ধ্বজের মতোই।

ছাত্তর দেখল, সামনের লম্বা বারান্দা দিয়ে একজন কাজের মেয়ে দৌড়চ্ছে।

আবার শোনা গেল, তুই ক্যান? খানকিটারে ডাক! বাবা-আ! বাবা-আ! আপনি কুথায়? আমি মুইত্যা ফেলছি। আমার শীত লাগতে আছে। বাবা-আ। শীত লাগতে আছে। আমার চাদর আর লুঙ্গিটারে পাল্টায়ে দিবার কন। বাবা-আ।

লাফিয়ে উঠলেন মুশকো স্যর। মানে, তাঁর পক্ষে যতটা লাফিয়ে ওঠা সম্ভব।

ডাকে-এ। আমারে বড়ুছেলে ডাকত্যাসে। যাই। খানিকটা অবিন্যস্ত ভাবে এগোলেন উঠোনের দিকে। ছাত্তর এগিয়ে গিয়ে ধরল স্যরের বাহু। চলুন, আমি ধরছি। দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে দেখা গেল মহিলাকে। মহিলার গতিমুখ, বারান্দা দিয়ে দ্রুত সেদিকেই, যেদিকে কাজের মেয়েটি দৌড়েছিল। পুরো বারান্দা জুড়ে দেখা গেল মহিলার দলমলে যাওয়াটা।

স্যর সেই যাওয়াটা দেখতে পেলেন না, যেটা তাঁর মধ্যবয়সি ছাত্তর নজর করল। কিন্তু স্যরও একরকম করে দেখলেন। আর আশ্বস্ত হলেন। যাউক। টিক অইব অ্যাইবার। বউমায় গ্যালো তো? গ্যালো না বউমায়?

ছাত্তর বলে, হ্যাঁ, গেলেন তো।

স্যর বলেন, অ্যাইবার আমিও যাই একবার। বড্ড বাবা-বাবা করে আইজকাল। খিদা লাগলে বাবা। হাইগ্যা ফ্যাললে বাবা, মুইত্যা ফ্যাললে, বাবা। অর মা-য়ে তো হেই কবেই গলায় দড়ি দিয়া আমার হাত থিকা র‍্যাহাই নিসে। অহন, আমি কী করুম? কও! অ্যাঁয়?

বারান্দাটা কাছে এসে গিয়েছে। সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছে ছাত্তর। উঠতে গিয়ে হঠাৎ ঘুরলেন মুশকো স্যর। গাছপালার ফাঁক দিয়ে তাঁর মুখে পড়ল মরে আসা রোদ। জোড়া ভুরু সাদা। কুচকুচে কালো মুখমণ্ডলে খোঁচা-খোঁচা সাদা দাড়ির ফুট বেরিয়েছে। ন্যাড়া মাথার জন্য কান দু'টো আরও যেন বড়। কালো রঙের দুই কানের পিঠে সাদা-সাদা চুলের গোছা। এক চোখে কালো ঢাকনা।

মুশকো স্যরকে প্রেতের মতো দেখায়। দীর্ঘ, বাঁকা, শীর্ণ এক প্রেত। বিকেলের প্রেত। গলাটা নামিয়ে ছাত্তরকে বলেন মুশকো স্যর। শুনো, তুমারে একখান কথা কই। রাখবা আমার কথাডা?

বলুন স্যর, নিশ্চয়ই রাখব।

এই অনাচার, এই ব্যভিচার, শুনলা তো? এইডা অহক্কলরে জানাইয়া দিতে পারবা, অ্যাকখান আব্‌রিত্তি লেইখ্যা? ল্যাখবা? আমার ফ্যামিলির এই যে একডা ফ্যাক্ট, এইডা লইয়া ছাপাইতে পারবা, ব্যাশ জুরালো দেইখ্যা অ্যাকখান আব্‌রিত্তি? অ্যাঁয়?

'ফেসবুক' কলামটি এখানেই শেষ।

চেনা, আধচেনা মানুষের মুখ, মুখের মিছিল

এ মনিতে কেমন আছেন? খবরটবর? ভাল? পোড়্ড়্চেন, লেখাটা? দেশেতে বেরুচ্চে? সেই সময়? পোড়্ড়্চেন?

হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই লেখাটা সবাই পড়ছে।

আসলে কী জানেন, ওই লেখাটায় না আমার একটা পার্ট আছে! বুয়েছেন। একটা পার্ট! আমার।

পার্ট আছে? মানে?

ওই দেখবেন, ওখানে একজন নাচিয়ে আছে না? মানে গানটান গায়, বাইজি মহিলা আর কী! হীরাবুলবুল?

হ্যাঁ আছে।

ওই মহিলার সঙ্গে সঙ্গে একজন লোক থাকে। রাইচরণ। ওই পার্টটা আমার। আমি কেটে-কেটে রাখছি পাতাগুলো। প্র্যাকটিস করছি, মানে পার্টটা। আসবেন একদিন। দেখাব করে। আজই, চলুন না? আজ?

অমূল্য মুখুজ্যে। তোমার থেকে চল্লিশ বছরের বড়। তখন তোমার চব্বিশ। ওঁর চৌষট্টি। কিন্তু 'আপনি' করে বলবেনই। তালঢ্যাঙা বলতে যা বোঝায় তাই। লম্বাটে মুখ। চোখ দু'টো যেন কোটর থেকে তাকায়। নাকটা খাড়া। অত লম্বা কিন্তু ঝুঁকে দাঁড়ান না। বসেন পিঠ সিধে রেখে। দু'পাঁচ মিনিট কথা বললেই চোখে পড়বে হাত দু'টো। আজানুলম্বিত বাহু কথাটা পড়েছ বইতে কিন্তু দেখেছ কি? এই অমূল্য মুখুজ্যেরই দেখলে। হাত দু'টো কেন চোখে পড়বে? কথা বলতে বলতে হাতের লম্বা আঙুল এমন বাঁকাবেন—এত মুদ্রা আসবে তাতে—যে হাত দু'টো না দেখে পারা যাবে না। দু'টো হাত কাঁধের দু'ধারে ছড়িয়ে কিছু একটা বোঝাবেন হয়তো।

কী বোঝাবেন? নিশ্চিত কোনও অভিনয়।

হো চি মিন-টা কি দেখলেন? ফুলিয়ায় হল যে?

হ্যাঁ, গেছিলাম।

কই আপনাকে দেখলাম না তো? কীসে ফিরলেন? লাস্ট শান্তিপুর লোকালে?

না না লরি ধরে ফিরেছি। স্পন্দন একটা লরি থামাল। আমি আর স্পন্দন গেছিলাম তো।

ও, তাই বলুন। আপনার সঙ্গে দেখা হল না। সমীর লাহিড়ী ওটা ভালই করেছেন। ভাল মানে এক্সেলেন্টও বলতে পারি। তবে আমি হলে সমীরবাবুর মতো করতাম না। অ্যা-অ্যাকেবারে অন্য ভাবে করতাম বুয়েছেন? পালা ভাঙতে পেছুনে গেলাম। তখন গাড়িতে ওঠার তোড়জোড় চলছে। ভদ্রলোককে দু'এক কথা বলতেই আমার হাত জড়িয়ে ধরলেন। অ্যাপ্রিশিয়েট করলে তো আর্টিস্ট খুশি হবেই, তাই না? চলুন একটু বাড়ি গিয়ে দেখাই কীভাবে করব?

আরেকদিন যাব অমূল্যদা, আজ হবে না।

ঠিক আছে তাই হবে। এখন কী করবেন? বাড়ি গিয়ে পদ্য লিখবেন? ও অবশ্য আমি ঠিক বুঝি না। আসবেন কিন্তু!

আসব অমূল্যদা।

অমূল্য মুখুজ্যের বাড়িতে ঢুকতে হলে খুব সাবধানে ঢুকো। সে বাড়ি হল নানা শরিকের বাড়ি। ভেঙে ভেঙে পড়ছে বাড়িটা চারদিক থেকে। কেউ সারাচ্ছে না। শরিকদের মধ্যেকার ঝগড়ায় বিক্রিও হচ্ছে না। দু'ঘর ভাড়াটে ছিল। একজনরা উঠে গেছে। ভুতের বাড়িতে আছেন শুধু অমূল্য মুখুজ্যে। বাড়িটার গা ফাটা। ফাটল দিয়ে গাছ বেরিয়েছে।

অমূল্য মুখুজ্যে বাড়িতে ছাত্র পড়ান। তাতেই তাঁর চলে যায়। তেহট্ট না মাঝদিয়া কোথায় যেন তাঁর দেশের বাড়ি? মাঝে মাঝেই বলেন চলে যাবেন সেখানে। কিন্তু এখানে এতদিন কেন আছেন ঈশ্বরই জানেন।

তুমি ঢুকলে তো? ঢুকেই দেখবে উনি বই ঝাড়ছেন। অনেক অনেক বই তাঁর। ঘুমোন যে তক্তপোশে তারও একধারে ডাঁই করা বই। খদ্দরের পাঞ্জাবি আর পাজামা। মানুষটা ক্ষিপ্র। বিদ্যুতের মতো সাঁ করে ঘুরলেন, আসুন। পরশুদিন মুড়াগাছা গেলাম। শিবরাত্রির জন্য সারারাত তিনটে সিনেমা দেখাল। আমি অবশ্য সবগুলো দেখিনি। 'কুহেলী'-টা দেখলাম। ওটা সেকেন্ড বই ছিল। যার জন্যে লাস্ট ট্রেনটা পেলাম না। ভোরের দিকে লালগোলা এল, তাতে ফিরলাম।

অতক্ষণ কী করলেন?

কেন, স্টেশনে বসে রইলাম! আপনি 'কুহেলী' দেখেছেন?

হ্যাঁ, দেখেছি।

বুঝলেন তো, ওখানেও আমার একটা পার্ট আছে।

ও তাই না কি! জানতাম না তো? খেয়াল করিনি দেখার সময়।

অমূল্য মুখুজ্যে পাঁচ-ছয়ের দশকে বাংলা সিনেমায় ছোট ছোট রোল করেছেন। ধরা যাক কেউ মারা যাচ্ছে, একজন পাদ্রি এলেন। একটা সংলাপ। কিংবা ছেলের অসুখ, ডাক্তারবাবু গম্ভীর মুখে পরীক্ষা করছেন, প্রেসক্রিপশনের কাগজকলম হাতে তাকালেন। দু'টো সংলাপ। নায়িকা ক্লাসিকাল গান গাইছেন, পাকাদাড়ি-পাকাচুল ওস্তাদ তান দিচ্ছেন। একটা সংলাপও না। তা ছাড়া, বোর্ডে—মানে আগে প্রফেশনাল থিয়েটার বলে যে জিনিসটা ছিল, তাতেও—ছোট ছোট পার্ট করেছেন। কিন্তু কেউ মনে রাখেনি বা বড় পার্ট করতে ডাকেনি। তোমাদের এইসব ছোট-ছোট টাউনগুলোতেও যাত্রা-থিয়েটার হয়েই চলেছে, তারা ডেকেওছিল অমূল্য মুখুজ্যেকে। কিন্তু কোনখানেই খাপ খাওয়াতে পারেন না অমূল্য মুখুজ্যে, দু'দিন রিহার্সালের পরেই যাওয়া ছেড়ে দেন। ফলে, তুমি, কোনওদিনই অমূল্য মুখুজ্যের কোনও অভিনয় দেখোনি।

কিন্তু এখন তুমি খুব উত্তেজিত। সে কী, কুহেলী-তে আপনি পার্ট করেছেন? আর আমারই চোখে পড়ল না? ছি ছি! কোনখানটায় ছিলেন বলুন তো?

অমূল্য মুখুজ্যে হাসেন। তিনি এখন উবু হয়ে প্রাইমাস স্টোভ জ্বালিয়ে চা বানাচ্ছেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, না না, আমি পার্ট করিনি। আমি বলছি, ওখানে আমার একটা পার্ট আছে। পার্টটা করেছে অজিতেশ ব্যানার্জি। ঠিকমতো পারেনি।

তোমার চোখ কপালে উঠল! বলেন কী! পারেনি? ওই অজিতেশের জন্যই তো আমি কুহেলী সিনেমাটা পাঁচবার দেখেছি।

কী জানেন, ওটা অজিতেশবাবুর পার্ট না। ওটা আমার পার্ট। আমিও পরশুদিনটা ধরলে বারতিনেক দেখলাম। এই নিন চা ধরুন।

কাচের গ্লাসে চা বাড়িয়ে দিলেন অমূল্য মুখুজ্যে। তারপর তক্তপোশটায় বসলেন। জানলার গরাদে মরচে ধরা। গরাদ জড়িয়ে লতাগাছ উঠেছে।

আমি হলে, বুয়েছেন, অন্যভাবে করতাম। অন্তত ওই জায়গাটা।

যখন সন্ধ্যা রায়কে বলছে 'এতদিন ধরে অনেক খুঁজেছি তোমায়'। আসলে হয়েছে কী...কী-ই হয়েছে বলুন দেখি?

তুমি হতবুদ্ধি। তাকিয়ে আছ। কিছুই বুঝতে পারছ না। কোনওমতে বললে, কী হয়েছে?

ওই সত্যভূষণ বলে লোকটি চম্পা নামে এক মহিলার কাছে যেত। বা-আ, রেখেছিল। মানে যেমন হয় আর কী! সে বাইজির নাম ছিল চম্পা। আর সে বাইজির ছিল এক যমজ বোন। সে হল অপর্ণা। নায়কের বিয়ে করা বউ। কেমন?

তুমি মাথা নাড়লে। কুহেলী সিনেমার গল্পটা মোটামুটি ঠিকই বলছেন অমূল্য মুখুজ্যে।

এইবার হল কী, সেই চম্পা কোথাও একটা চলে যায় বা পালিয়ে যায়। তাকে এই সত্যভূষণ মানে অজিতেশবাবু, অনেক খুঁজেছে। মানে অ-নে-ক। হঠাৎ এই রায়কুঠিতে বিরাট বড়লোকের বউ হিসেবে তাকে দেখল। মানে আবিষ্কার করল আর কী। কেমন তো?

তুমি আবার ঘাড় নাড়লে।

এ-ইটা আসল। ওই যে খুঁজেছে, সেইটা। অত হাঁকাহাঁকি করলে, ওইরকম ভয় পাইয়ে দিলে অত হা-হা করে হাসলে সেটা ফোটানো যায় না কি! একটা কষ্ট আছে না লোকটার? মানে ওই সত্যভূষণের? ভালবাসবার কষ্ট? ওই পার্টটা আমার পার্ট। ওই যে চম্পা বলে মেয়েটা, সন্ধ্যা রায়, যে হারিয়ে গেছে, তাকে খুঁজেছে তো! অত হা-হা করে হাসলে হয়? তবে আবার এটাও দেখুন, সন্ধ্যা রায় ও-বইতে ডবল সন্ধ্যা রায়, এ বউটা মানে রায়কুঠিতে নায়ক বিশ্বজিৎ-এর বউ হয়ে আছে যে সন্ধ্যা রায়—সেই সন্ধ্যা রায় তো কিছু বুঝছে না! কিন্তু সত্যভূষণ তো ওই রায়কুঠির বউটাকেই ওর সেই চম্পা মনে করছে—তাই না? ডবল পার্টের মজাটা তো ওইখানে। তবে ওর চম্পা মনে করাটা কিন্তু মিথ্যে নয়, একেবারে জেনুইন। মানে সত্যভূষণের—তাই, ওটা, হেঃ, আমার পার্ট। কিছু মনে করবেন না, ওটা অজিতেশ ব্যানার্জির পার্টই নয়।

তুমি হাঁ করে তাকিয়ে আছ। লোকটা কি পাগল?

অমূল্য মুখুজ্যে উঠে দাঁড়ান। সিনেমায় থিয়েটারে পার্ট দেখে মন ভরে না। বুয়েছেন। সারা-আ-খ-খ-অ-ন আমার পার্টটা অন্য কেউ করে চলেছে আর সেইটেকেই বসে বসে দেখছি, বুয়েছেন সহ্য করা যায় না, হাত-পা একেবারে নিশপিশ করে। ওই জন্যই সিনেমা-থিয়েটার দেখা বাদ দিয়ে শুধু বই পড়ি। বই। বই পড়লে অনেক কিছু ইম্যাজিন করা যায়। বই আপনার ইচ্ছের অনেক কাছাকাছি। মানে, বই জিনিসটাই আর কী!

তুমি জানো অমূল্য মুখুজ্যের কাছে ইংরিজি বাংলা বহু নাটকের বই আছে। গল্প-উপন্যাসও আছে। তোমাকে ধার দেন। সাতদিনের জন্য। আটদিন হয়ে গেলেই সকালে তোমার বাড়িতে কড়া নড়ে। জানলা দিয়ে দেখলে, অমূল্য মুখুজ্যে। এ কী অমূল্যদা আপনি! ভেতরে আসুন বসুন। না ভেতরে আসব না। ছাত্তরদের লিখতে দিয়ে এসেছি। বইটা কি আপনার পড়া হয়ে গেছে? লজ্জার একশেষ!

তাই তুমি বললে, বই পড়েন মানে নাটকের বই?

না না, বলতে বলতে অমূল্য মুখুজ্যে উঠে দাঁড়ালেন। চুনবালি খসা ঘরে তিনি একটা রোগা দৈত্য। না না, নাটকের বই নয়। নবেল। গপ্পোর বই। এইসব। যেমন ধরুন, 'ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সী'! পোড়েছেন? উঁ? ওখানে একটা পার্ট আছে আমার। ওই ওল্ড ম্যান, ওইটা আমি। বলে, অমূল্য মুখুজ্যে হাসলেন।

কিন্তু অমূল্যদা ওটা থিয়েটার হবে কী করে?

না মানে ধরুন যদি সিনেমাটা হয়। তা হলে! কী করব আমি?

কী করবেন?

অমূল্য মুখুজ্যে হাসলেন। তা-কা-বো! শু-দ্-দু তাকাব! বুয়েছেন না? তাকিয়ে সব বলব। নো ডায়লগ। দেখবেন? অমূল্য মুখুজ্যে একটা কাঠের চেয়ারে বসেছিলেন যার হাতটা ভেঙে পড়ে গিয়েছে কবে। অন্য হাতটা নড়বড়ে। সেই চেয়ারে বসে

অমূল্য মুখুজ্যে দরজার দিকে একবার তাকালেন। বাইরে অপরাহ্ণের আলো, মূলতান আর ভীমপলাশের মাঝামাঝি একটা সময়ের আলো তখন। আবার অমূল্য মুখুজ্যে জানলার দিকে তাকালেন। মুখটা ঘুরিয়ে। হঠাৎ ঘরটা নিস্তব্ধ লাগল। দু'টো তাকানো মিলিয়ে তিন মিনিট মতো। হয়তো পাঁচ মিনিটও হতে পারে। যেন তুমি ওই ঘরে নেই। শুধু প্রচণ্ড একজন লোক। এইভাবে তিনবার তিনরকম মুখে তাকিয়ে চুপ করে থাকলেন। আবার মিনিট পাঁচেক কাটল। অস্বস্তি হচ্ছে তোমার। দম-বন্ধ ভাব হচ্ছে। তারপর হঠাৎ উঠে দরজার সামনে চলে গেলেন। দরজা দিয়ে যে আলো আসছিল, লম্বা চেহারাটা সেই আলো আড়াল করেছিল। এবার ঘুরলেন ধীরে-ধীরে। দরজার সামনে থেকে ঘুরে যেতেই মুখে ছায়া পড়ে গেল। ঘরের উল্টো দিকে ভাঙা-ভাঙা দেওয়ালটা দেখছেন একদৃষ্টে। ছায়াটা তোমার চোখে সয়ে যেতে দেখতে পেলে ভুরুতে সামান্য 'কুঞ্চন'। চোখটা এবার খানিকটা দেখতে পাচ্ছ। বুঝতে পারছ তুমি, ওই চোখ দু'টো ঘরের মাত্র হাত ছয়েক দূরের দেওয়ালটা মোটেই দেখছে না। অনেক অনেক বেশি কোনও দূরত্বকে দেখছে। যে-দূরত্বের শেষে হয়তো জলের ওপর দিগন্তরেখা। বাঁ হাতটা ধীরে-ধীরে চোখের ওপর তুলে আনলেন। আবার নামিয়ে দিলেন। তারপর আবার নিজের ভাঙা চেয়ারটার দিকে ফিরতে ফিরতে বললেন সোমুদ্রো। বুঝলেন না, সোমুদ্রো—ও—ও! মা—আ—নে বি—ই—রা—ট একটা দূর। সেটা দেখছেন তো! মানে, ইম্যাজিন করতে পারছেন। আশ্চর্য তো, পদ্য লেখেন, আর ইম্যাজিন করতে পারছেন না! সোমুদ্রো, ব্যাপারটাই তো মানে কী বলে? কী করে বলব? সোমুদ্রো ব্যাপারটা তো সোমুদ্রো! তাই না! আর বুড়োটা? মানে ওই সান্তিয়াগো? দাঁড়ান আরেকবার চা বানাই। সোমুদ্রো আর ওই ওল্ড ম্যান। ওই সান্তিয়াগো। ওই বুড়োর পার্ট তো আমার পার্ট। প্র্যাকটিস করি। কোনওদিন করতে চান্স পাব না, কিন্তু প্র্যাকটিস...করি। এই তাকানোটা। বিস্কুট খাবেন? থিন আছে। খাবেন?

একটা হরলিকসের শিশি খুলে দু'টো বিস্কুট আমাকে দিলেন । দিয়ে বললেন, ওই ওল্ড ম্যানটাও একলা—সোমুদ্রোটাও একলা! অ্যাক-লা-আ! এইখানেই মজাটা। এখানেই ওই পার্টটা আমার। আর কারও নয়। ধরুন। বুড়োটা যেমন সোমুদ্রোটাকে দেখছে। ওই সোমুদ্রোটাও তো বুড়োটাকে দেখছে। আমি তো সোমুদ্রো-র দেখাটাকেও আমার তাকানো দিয়ে বার করব। তাই না? সোমুদ্রের পার্টটাও তো করতে হবে আপনাকে, যদি বুড়োর পার্টটা করতেই চান! আমি প্র্যাকটিস করি। মেনলি রাত্তির বেলাটা। প্র্যাকটিস করি। এই নিন, গেলাসটা ধরুন।

পাগল যে তাতে কোনও সন্দেহ করো না তুমি। যাত্রা বা নাটক করে এমন অনেকের সঙ্গে চেনা আছে তোমার, যারা এই টাউনে বা আশেপাশের গ্রামে থাকে। কিন্তু তাদের কারও সঙ্গেই মেলামেশা নেই অমূল্য মুখুজ্যের। তিনি সকালে ছাত্র পড়ান বাড়ির বারান্দায়। নয়তো বই ঝাড়পোঁছ করেন, নয়তো বই পড়েন। আর পাবলিক লাইব্রেরিতে রাত আটটার দিকে যান। হোটেলেই খাওয়া-দাওয়া করেন। অমূল্য মুখুজ্যের কাছে অনেক বই। তাই সম্পর্ক রাখো তুমি। যে উপন্যাসই অমূল্য মুখুজ্যে পড়ুন, সেই বইতেই তিনি তার একটা পার্ট খুঁজে পান। সিনেমা-থিয়েটার দেখা ছেড়ে দিয়েছেন প্রায়। একদিন বললেন, 'নিশাচর' সিনেমাটা দেখেছেন। পুরনো বই। দেখেছেন!

হ্যাঁ। শম্ভু মিত্র অভিনয় করেছেন। দেখেছি।

ওই বইতে আমার একটা পার্ট ছিল।

তুমি এবার খোঁচাও। কী পার্ট, শম্ভু মিত্রের পার্টটা কি?

খোঁচাটা বুঝতে পারলেন না অমূল্য মুখুজ্যে। বললেন, না না, শম্ভু মিত্তির বা বিকাশ রায়ের পার্টগুলো তো মেন পার্ট, ওগুলো না। জ্ঞানেশবাবুর একটা পার্ট আছে। একজন চাকর। সম্পূর্ণ বোবা। জ্ঞানেশবাবু শুধু তাকাচ্ছিল। বুয়েছেন। জ্ঞানেশবাবুর ওই ভয়েস। কিন্তু ব্যবহার করতে হয়নি। তাকানোটা কেবল। ভা-ল। ভা-আ-ল। তবে আমি হলে...খুউব মার খেয়েছে জ্ঞানেশবাবু, মানে চাকরটা, এখেনে সেখেনে রক্ত...তার মধ্যে...তাকাচ্ছে। বেশ। বেশ। তবে আমি, আ-আ-মি করলে-এ!...

একদিন তুমি দাঁড়িয়ে আছ রাখালদার চায়ের দোকানের সামনে, অমূল্য মুখুজ্যে আর তুমি। রাখালদার চায়ের দোকানটা হচ্ছে একটা ১৩/১৪ ফুট চওড়া গলিরাস্তার পাশে। দোকানের বাইরে কোনও বেঞ্চি রাখার জায়গা নেই, রাস্তা ব্লক হবে। রিকশা, সাইকেল, সাইকেল ভ্যান যেতে পারবে না। দোকানটার ভেতরে দু'টো বেঞ্চি, ইংরেজি 'এল' আকারে রাখা। সে-দোকান সবসময়ই ভর্তি থাকে। রাখালদা তোমাদের দিকে চা বাড়িয়ে দিলেন। রাস্তা থেকে হাত ঝুঁকিয়ে চায়ের গেলাস নিয়ে রাস্তাটার উল্টোদিকে চলে এলে তোমরা, যেখানে দাঁড়িয়ে, নিরিবিলিতে চা-টা খাওয়া যাবে। তোমাদের পাশে একটা ছোট্ট পথমন্দির। পিছনে বন্ধ হয়ে যাওয়া পুরনো সরকারি হাসপাতাল। এখানে দাঁড়িয়ে দোকানটা স্পষ্ট দেখা যায়। চায়ের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে বললেন অমূল্য মুখুজ্যে—জানেন, এই দোকানটার মধ্যেও আমার একটা পার্ট আছে।

তুমি চমকে উঠলে। আরে! কী বলছে লোকটা? মানে! অমূল্যদা! কী বলছেন ঠিক বুঝতে পারলাম না।

বলছি, এই দোকানটার মধ্যেও আমার একটা পার্ট আছে! ওই দেখুন, বেঞ্চগুলো তো 'এল' আকারে সাজানো। ওই কোনায় একটা লোক বসে আছে দেখছেন? দেখুন, বাঁদিক থেকে দেখুন, ও-ই লোকটা, ফোর্থ। দেখছেন?

হ্যাঁ, বলুন।

লোকটাকে তুমি দেখতে পেলে। অমূল্য মুখুজ্যে বলছেন, গেলাসটা ধরেছে দেখেছেন? বাঁ হাতে? ডান হাতে হাফ পাউরুটি। খেতে কিন্তু ওর মন নেই। দেখুন, মানুষ তো যা-ই খাক, খাওয়ার আগে খাদ্যটাকে একবার দ্যাকে! দ্যাকে তো! লোকটা দেখছে না। নিশ্চয়ই প্রচণ্ড কোনও দুশ্চিন্তার মধ্যে আছে! খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। জামাটা ঘেমো, আধময়লা। বুঝেছেন? কেমন তাকিয়ে আছে। দেখুন! ও আসলে ওই দোকান, চায়ের গেলাস, হাফরুটি, চারপাশের লোক—কিচ্ছু দেখছে না। দেখছে ওর সমস্যাটা। ওর জীবনটা। যার কিছুই আমি জানি না। কিন্তু ওই তাকানোটা তো জানি। ওই আধভাঙা হয়ে বসে থাকাটা। ওই ঘাড়টা খানিক নামিয়ে ওই বসা। মানুষ ভেঙে পড়তে পড়তে বা ভেঙে পড়ার ঠিক আগে এমন করে বসে থাকে। ওই লোকটার পার্টটা আমার পার্ট। তার মানে ওই দোকানটা একটা বই বুঝেছেন তো? ওই দোকানটাও আপনি পড়তে পারেন। পড়লে নিজের পার্ট পেয়ে যাবেন। দেখুন দেখুন, লোকটা কীভাবে পয়সা পকেট থেকে বার করছে ওটা দেখুন। এখুনি করে দেখাতে ইচ্ছে করছে। বাড়ি চলুন। দেখাচ্ছি।

অমূল্য মুখুজ্যের সঙ্গে চলেছি। তাঁতকলের ছুটি হয়েছে। ঘাট পেরিয়ে উঠে আসা তাঁতকলের অজস্র মেয়ে-পুরুষ হাতে টিফিন কেরিয়ার আর চটের থলে নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে হাঁটছে। নদীর ঘাট থেকে রেলস্টেশন একটাই লম্বা রাস্তা। প্রায় দৌড়ে পৌঁছবে ওরা। ট্রেন ধরে আরও ছোট ছোট স্টেশনে নামবে। বিকেলের ট্রেন এসেছে। যাত্রীরা নেমে বেরিয়ে আসছে। একটা ছোট মিছিল যাচ্ছে। বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের মিছিল। সামনে তাদের নেতা বিষ্টু অধিকারী। দীর্ঘকায় অমূল্য মুখুজ্যে মাথাটা তোমার কানের কাছে নামিয়ে বললেন, বিষ্টু অধিকারীর পার্টটাও আপনাকে করে দেখাব একদিন। বিষ্টুর বক্তৃতা শুনেছেন কখনও? এ কী বলছেন! এ-টাউনে সবাই শুনেছে। রাস্তার একধারে তোমরা দাঁড়িয়ে আছ দু'জনে। ভিড়ে ভর্তি হয়ে আছে পথ। ভিড় একটু হালকা হলে তোমরা রাস্তা পার হবে। অমূল্য মুখুজ্যে বললেন, এই যে ক্রাউড দেখছেন, এই ক্রাউডের মধ্যেও আমার পার্ট আছে! দেখুন, এক-একটা লোক, এক-একরকম ভাবে হাঁটছে। এক-একজনের মুখ এক-একরকম। কেউ এক নয়। সবাই আলাদা। সবাই একা। সেই একাটাকে ধরতে হবে বুঝলেন। সেই 'আলাদা'-টাকে। 'আলাদা'

বোঝেন তো, 'আলাদা'?

সেদিন তাঁর ঘরে নিয়ে গিয়ে সন্ধেবেলায় অমূল্য মুখুজ্যে কত কী যে বললেন! তোমার মাথা ভোঁ-ভোঁ করতে লাগল। হঠাৎ তাক থেকে একটা বাঁধানো বই দেখালেন। এ বইটা পড়েছেন? এ বইতে আমার একটা পার্ট আছে! এ কী, এ তো কবিতার বই! কবিতার বইতে আপনার পার্ট থাকবে কী করে? বোদলেয়রের কবিতা। হ্যাঁ। ট্রান্সলেশন! বুদ্ধদেব বোসের ট্রান্সলেশন। লাইব্রেরির বাচ্চু আমাকে দিলে বইখানা। কবিতায় আপনার পার্ট কী করে থাকবে অমূল্যদা? না, না, বইখানা পড়ে দেখুন। ওই বোদলেয়র বলে লোকটার লাইফ-হিস্ট্রি দিয়েছে বুদ্ধদেব বোস। পেছুনে। পদ্যটদ্যগুলো মাঝখানের দিকটায় তো! লাইফ-হিস্ট্রিটা বইটার পেছুনে। পোড়েছেন। হ্যাঁ পড়েছি তো। দেখবেন। ওই বোদলেয়র বলে লোকটা, একজন মহিলার সঙ্গে...কিছুদিন...। মানে ওই যাকে বলে রেখেছিল আর কী। জান দুভাল নাকি কী একটা নাম মহিলার। মানে ভালবাসত আর কী। বিয়েটিয়ে নয়। এমনিই থাকত। হোটেলে রেখেছিল। লোকটা সারাদিন পর বাড়ি এসে দেখত ওই মহিলার এক আত্মীয় এসে বসে আছে। দাদা না কী-রকম-কিছু হয়টয়। থাকতে থাকতে একদিন জানা গেল, বুদ্ধদেব বোস লিখে দিয়েছে, লোকটা ছিল ওই মহিলার পুরনো....মানে, পুরনো...ওর সঙ্গে আশনাই-টাশনাই...আর কী...ছিল-টিল। ভদ্রভাবে লিখেছে—'প্রাক্তন' প্রেমিক। বোদলেয়র বলে লোকটা, নিজের আর ওই মহিলার খরচ চালাতে হিমশিম খাচ্ছিল, তার মধ্যে আবার ওই মহিলার পুরনো নাগর। বুঝেছেন তো কী বিপদ!

তা তো বুঝলাম, আপনি তা হলে বোদলেয়রের পার্টটাও করতে চান? কিন্তু, অমূল্যদা, আপনি তো কবিতাগুলো পড়েননি। পড়েছেন?

না না, পড়িনি। ওই পদ্যটদ্যগুলো আমি একেবারে বুঝতে পারি না জানেন।

তা হলে, বোদলেয়রের কবিতা না-পড়ে, বোদলেয়রের পার্ট আপনি করবেন কী করে?

বোদলেয়রের পার্টটা তো আমার পার্ট নয়। আমার পার্ট হচ্ছে ওই লোকটার পার্টটা। ওই যে, খুঁজে খুঁজে পুরনো মেয়েলোককে বার করেছে। তারপর তার নাগরের পয়সায় বসে বসে খাচ্ছে! আর দাদার অভিনয় চালাচ্ছে। ওই পার্টটা। আমার পার্ট!

অন্ধকার হয়ে গিয়েছে বাইরে। লোডশেডিং। অমূল্য মুখুজ্যে লণ্ঠন জ্বালালেন। দু'টো। ঘরের দু'দিকে টাঙালেন। সেটা শীতকাল। গায়ে একটা খয়েরি চাদর। এখন চাদরের রংটা কালো দেখাচ্ছে। দ্বিতীয় লণ্ঠনটা দেওয়ালের গায়ে আংটায় ঝুলিয়ে দিয়ে ফিরে তাকালেন। সবাই মনে করে আমি একা। আমার কেউ নেই। আপনারা সবাই তাই ভাবেন। পচা সান্ডেল কী বলেছে জানেন! বলেছে, অমূল্য মুখুজ্যেকে 'চিত্রগ্রীব' বইটা পড়তে দে বাচ্চু, পায়রার পার্ট করবে অমূল্যদা! জানেন। বলেছে একা থেকে থেকে আমার মাথার গণ্ডগোল হয়ে গিয়েছে।

কে বলেছে আমি একা! লাইব্রেরিতে কত বই আছে, সব বইতে আমার কোনও না কোনও পার্ট আছে। রাস্তার দু'ধারে দোকান দেখছেন, সমস্ত দোকানে একটা না একটা পার্ট আছে আমার। রাস্তায় কত লোক চলছে, সবার মধ্যে আমার পার্ট আছে। এই যে চূর্ণীতে খেয়া পারাপার হয়, নৌকো ভর্তি করে যত লোক যাচ্ছে, বাসগুলোর গায়ে-মাথায় চেপে-ঝুলে যত প্যাসেঞ্জার চলে যাচ্ছে তাহেরপুর ফুলিয়া শান্তিপুর ভাতজাংলা—তাদের সবার মধ্যে আমার পার্ট আছে। আমি একা নই। পচা সান্ডেলকে কী বলেচি জানেন, মিউনিসিপ্যালিটির মোড়ে?

কী বলেছেন অমূল্যদা! বলেছি, পচা, এখনও সি-ক্লাস অ্যাক্টর-ই আছিস। ইম্যাজিনেশন নেই তোর। নইলে একটা পাখির মধ্যেও আমার পার্ট আছে। করতে জানলে করা যায়। তবে আপনাকে বলছি, করলে আমি পায়রার পার্ট করব না। আমি শকুনের পার্ট করব, বুঝেছেন শকুন! শো-ও-কু-উ-ন! বলে, অমূল্য মুখুজ্যে তাঁর দু'টো হাত দু'দিকে ছড়িয়ে দিলেন, যেন দু'টো বিশাল ডানা উড়াল দিল লণ্ঠনের আলোতে। হাত থেকে কালো চাদর ঝুলছে। যেন সত্যিই বিশাল একটা দানবীয় পাখি তিনি। এইমাত্র ডানা ঝাপ্‌টে উড়ে যাবেন রাত্রির আকাশে।

ফেসবুক-এর সব চরিত্রের মতন এরপর, অমূল্য মুখুজ্যেরও হারিয়ে যাওয়ার পালা। কীভাবে হারিয়ে গেলেন তিনি? শরিকরা একমত হয়ে সেই বাড়ি বিক্রি করে দিল। বাড়ি ভাঙা পড়ল। তখন সদ্য প্রোমোটাররা এসে পৌঁছচ্ছে ছোট ছোট টাউনে। একটা লরিতে সব বই, তক্তপোশ ভাঙা চেয়ার চাপিয়ে তেহট্ট না মাজদিয়া কোথায় সেই তার দেশের বাড়িতে থাকতে চলে গেলেন অমূল্য মুখুজ্যে।

লরিতে ওঠবার আগে চমৎকার হাসলেন। ড্রাইভারের সঙ্গে গল্প করতে করতে যাই। ওর পার্টটাও তো থাকার কথা আমার মধ্যে। দেখি প্র্যাকটিস করা যায় কি না। তা ছাড়া সব বই নিয়ে যাচ্ছি তো। প্র্যাকটিস করব। আসবেন। একটা পোস্টকার্ড ফেলে দেবেন। স্টেশনে থাকব।

যাওয়া আর হয়নি তোমার। তবে পচা সান্যাল আর দেবু কুণ্ডু নামের দুই সিনিয়রের কাছে তুমি শুনতে পেয়েছিলে অমূল্য মুখুজ্যের পূর্বজীবন-কথা। সিনেমা-থিয়েটারের পার্ট করার সময়, কলকাতায় ছোট একটা চাকরি করতেন অমূল্য মুখুজ্যে। অফিস-ক্লাবের এক অভিনেত্রীকে বিয়ে করেছিলেন তিনি, ঘরভাড়া নিয়ে রাজাবাজার এলাকায় থাকতেন। আর তাঁদের সঙ্গে একই বাড়িতে থাকত সেই অভিনেত্রীর নিজের দাদা। তুই-তুই করে কথা বলতেন দাদা আর বোন। পচা সান্যাল-রা সে-বাড়িতে গিয়ে নিজে চোখে দেখে এসেছিলেন তাঁদের দাম্পত্য জীবন। কিন্তু, একদিন, একটি চিঠি লিখে, সেই দাদা আর বোন একত্রে গৃহত্যাগ করেন। চিঠিতে জানা যায় তারা কস্মিনকালেও দাদা-বোন ছিলেন না। পাশাপাশি বাড়িতে থাকতেন বলে তুই-তোকারি চালু ছিল। এই ঘটনার পর চাকরি ছেড়ে অমূল্য মুখুজ্যে এই টাউনে চলে আসেন। এবং পচা সান্যালদের মতে, তাঁর মাথা খারাপ হয়ে যায়।

এর বেশ কিছুকাল পরে তুমি কলকাতায় চলে এসেছ। সেও কুড়ি বছর হয়ে গেল। অমূল্য মুখুজ্যের বয়স এখন নব্বই পার হয়েছে। দেশের বাড়িতে স্বপাক রান্না করে খান। সকাল-বিকেল হেঁটে বেড়ান। এতদিনেও কোনও বড় অসুখ করেনি তাঁর। এই পর্যন্ত খবর পেয়েছ তুমি। এই লোকটি রোগব্যাধির চিহ্নহীন দীর্ঘজীবন পাবে না তো কে পাবে? যে মানুষ রাস্তার প্রত্যেকটি চলমান লোকের মধ্যে নিজের পার্ট দেখতে পায়, যে সমুদ্রের পার্ট করতে পারে, শকুনের পার্টও! তোমার অনেকবার মনে হয়েছে, যিনি অভিনেতা তিনি কোথাও ঈশ্বর। তোমার মনে পড়ে লণ্ঠনের আলোর দু'হাত ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সেই সিক্স-ফিটার রোগা দৈত্য, দু'হাত থেকে ঝুলছে কালো চাদর, তীক্ষ্ণ চোখ, খাড়া নাক, দাগে ভরা মুখ, বলছেন, ওই বইটা পড়েছেন? ওই দোকানটা পড়েছেন? ওই রাস্তাটা পড়েছেন? ওই সমুদ্রটা পড়েছেন? ওই মরুভূমিটা পড়েছেন ওই পর্বতমালা? বলছেন, ওর সবগুলোর মধ্যে আমার পার্ট আছে...প্র্যাকটিস করি, জানেন, আমি প্র্যাকটিস করি...একদিন সারারাত তুমি অমূল্য মুখুজ্যের সঙ্গে গল্প করে কাটিয়েছিলে। উনি বলছিলেন পর্বতের পার্টও করা যায়। স্থির হয়ে। স্থির। বলে দাঁড়িয়ে রইলেন, তাঁর শরীর ও মুখের একটা পেশিও কাঁপছে না। স্বয়ং স্তব্ধতা এসে অধিষ্ঠান করছে এই অভিনেতার প্রস্তরীভূত মুখে। পুরো চরাচর নিস্তব্ধ, পাঁচ মিনিট, সাত মিনিট। অনন্তকাল। কী স্থির। হঠাৎ আশেপাশের গাছ থেকে ভোরের পাখি ডাকতে শুরু করল! তোমার মনে হয়েছিল সত্যিই তুমি একটি পাহাড়ের পায়ের কাছে বসে আছ...এখুনি সূর্য উঠে আসবেন, এসে নমস্কার জানাবেন এই নগাধিরাজকে...।

চেনা, আধচেনা মানুষের মুখ, মুখের মিছিল

মুচঁ চলো করে তাকায়। 'মরা ডাক্তার'। চশমা খোলা অবস্থায় বা চশমা পরে থাকলেও তাকানোটা ছুঁচলো। ওই ছুঁচলো তাকানোটা যে দেখেছে, সে-ই শুধু বুঝবে। বাহ্যি হয়? প্রশ্ন। হয়, ডাক্তারবাবু—উত্তর। কিরমি পড়ে? প্রশ্ন। পড়ে ডাক্তারবাবু—উত্তর। গুঁড়িগুঁড়ি, না বড়? বড় ডাক্তারবাবু—প্রশ্ন ও উত্তর। তেতো তেতো লাগে, জিব্বায় (মানে জিহ্বায়)? না ডাক্তারবাবু। বাহ্যি ভস্কা ভস্কা, না পাতলা পাতলা? এবার প্রশ্ন সত্ত্বেও উত্তর নেই।

থাকবে কী করে? যাকে জিগ্যেস করা হচ্ছে, সে একজন তরুণী, বাইশ-তেইশ বছর বয়স। কটা-বুড়োর দিদি, মিতুনি। কটা-বুড়োর যেমন ফরসা গা আর কটা চোখ, ওর দিদিরও তেমনি। সুন্দরী বলে নাম আছে। একঘর রুগির মাঝখানে সেই মিতুনিকে ওইরকম সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হচ্ছে। কতক্ষণ দেবে বেচারি মিতুনি? প্রতিবার প্রশ্নের পর রুগির উত্তর পেলেই, 'মরা ডাক্তার' একটা আওয়াজ করেন। কী আওয়াজ? ও-ও-ও! মানে হল, 'আচ্ছা বেশ বুঝেছি।' 'ও-ও-ও'টা দিয়ে এইটাই বোঝান মৃত ডাক্তার। মুখে টকগন্ধ হয়? শাড়ির খুঁট আঙুলে জড়িয়ে মুখ নিচু উত্তর এল, হয় ডাক্তারবাবু। ও-ও-ও-ও! এই আওয়াজটি যেই বেরল 'মরা ডাক্তার'-এর মুখ থেকে, সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁর হাতের পেনসিল সাদা কাগজে কী সব লিখল।

এইবার 'মরা ডাক্তার' নীরব হলেন। তিনি একটি বড় বাক্স খুললেন। একটা শিশি থেকে কয়েকটা গুলি ফেললেন ছোট চৌকো কাগজের ওপর। কখনও বা আরেকটা শিশি থেকে সাদা ময়দা-ময়দা দেখতে পুরিয়া কাগজে ঢেলে হাত দিয়ে একটু পাকাতে লাগলেন। পাকাচ্ছেন তো পাকাচ্ছেন। ছ'টা পাকানো হল। রোজ দু'টো কেমন? একটা এখুনি খেয়ে নিতে হবে আমাদের। বলেই বললেন, হাঁ, দেখি-ই। হাঁ-আ-আ-আ। সামনের পেশেন্টটি হাঁ করতে বাধ্য। এক্ষেত্রে কটা-বুড়োর দিদি মিতুনি হাঁ করল। সাবধানে আঙুলের দু'-তিনটে টোকায় রুগির জিভের ওপর ঝরে পড়ল ওষুধের গুঁড়ো।

এখানেই কিন্তু শেষ নয়। রুগি ছেলে-বুড়ো-বাচ্চা অথবা কামিনী-হস্তিনী-পদ্মিনী যেই হোক না কেন—'মরা ডাক্তার' কী করবেন? রুগি তো নিঃশব্দে মুখ বন্ধ করে মুখের ভিতর একটু জিভটা নাড়িয়ে নেবে। সেই সময়টা 'মরা ডাক্তারে'-র মুখে একটা আওয়াজ শুনবে সারা ঘরের লোক : 'ইয়া-য়া-য়া-ম, অ্যাঁ-ই-য়া-য়া-ম্-হ্যাঁ, এ-ই-ভাবে? কেমন?'

পসার খুব। সকাল-সন্ধে ভিড় হয়ে থাকে। টাউনে ইনিই সবচেয়ে নামকরা হোমিওপ্যাথ। বাইরে সাইনবোর্ড : ড. জীবিতকুমার দাস : D.M.S ব্র্যাকেটে ক্যাল। মানে কলকাতার কলেজ থেকে পাওয়া ডিগ্রি। ওইটুকু টাউনে কলকাতার ডিগ্রি বিরাট ডিগ্রি। বাপ-মা ওইরকম নাম দিয়েছিলেন বলে তিনি 'মরা ডাক্তার' নামে পরিচিত এখানে। তা ছাড়া স্বভাবের দোষও আছে 'মরা ডাক্তার'-এর। ছুঁচলো তাকানো তো বললামই। ঘষঘষে গলা। ধুতি-পাঞ্জাবি। হাতে কালো ব্যাগ। নাকে নেমে আসা চশমা। তার ওপর সারাক্ষণ ওইরকম সব প্রশ্ন। চুল মাথার অর্ধেকটাতেই পাকা। চলাফেরা, কথা বলা কোনওটাতেই জীবনের কোনও চিহ্ন নেই যেন। মা বেঁচে। বাড়ি ঠাকুরদার আমলের। বাড়ির সামনেই চেম্বার করেন সকাল-বিকেল। মায়ের সঙ্গে চেম্বারের পরে জগদম্বার মন্দিরে যান। মা মাঝে-মাঝেই এসে ডাক পাড়েন : খু-উ-ক-অ-ন! খাইয়া যাও দু'টো। ওষুধ খাইবা না?

বুড়ি খুব টরটরে। সারাক্ষণ মুখে পান। পেশেন্টদের সামনেই এসে বলেন, প্যাসেন্ট তো ভালই হইসে দেখতাসি। সুদ্দু বইসা বইসা রুগি মারলেই কি চলব? খাইতে হইব না? পেটে দু'টা দাও। জলখাবারও তো খাওনাই খুকন। বুড়ির কানে অবশ্য পৌঁছয়নি তাঁর খুকনকে টাউনের বজ্জাত লোকজনেরা 'মরা ডাক্তার' বলে। শুনলে টাউনের লোকের বাপের নাম ভুলিয়ে দিতেন বুড়ি।

এ-সব ক্ষেত্রে যা হয়, বাড়িতে একজন বউ থাকে। 'মরা ডাক্তার'-এরও আছে। বুড়ি বলেন, খুকনের বয়স ছয়-চল্লিশ। বউটি তাঁর ছেচল্লিশ বছরের খুকনের থেকে কিছু না হলেও পনেরো-ষোলো বছরের ছোট। 'মরা ডাক্তার' আর 'মরা ডাক্তার'-এর বউকে, জোড়ে, কেউ কোনওদিন বেরতে দ্যাখেনি টাউনে। বুড়ি তাঁর ছেলেকে নিয়ে বেরন সন্ধের পর মন্দিরে। আর ছেলের বউয়ের সঙ্গে মাঝে-মাঝে যান স্টেশন-বাজারের দিকে, রিকশায়। বুড়ি রিকশায় বসে থাকেন। বউ গিয়ে শাশুড়ির পান কেনে, জর্দা কেনে। বউকে তিনি বউমা বলেন না। ডাকেন : ও, পোভাতি! অর্থাৎ প্রভাতী। টাউনের লোক খুবই বদমাইশ। তারা বলে, বউ তো কোনওদিন পোয়াতি হবে না, তাই বুড়ির ডেকেই সুখ। কে জানে হবে কি না। তবে বিয়ে হয়েছে বছর সাতেক। বউটা ভাল। বাড়ির পিছনে বিরাট ফুটবল মাঠ। ছেলেপুলে খ্যালে। বউটা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দ্যাখে ছাদ থেকে। দুপুরে বারান্দায় বসে মস্ত জাঁতি হাতে সুপুরি কাটে শাশুড়ির জন্য। বাড়ির একদিকে বাগান। কাঁঠাল, আম, পেয়ারা, নিমগাছ। বউয়ের ঘরটি তিনতলায়। নিমগাছটি বউয়ের ঘরের একধারে। সারাদিন নিমের হাওয়া।

উল্টোদিকে গুলটিদের বাড়ি। গুলটি, ছেলে হিসেবে, প্রচণ্ড পাজি। কালকেই মাথা ফাটিয়ে বাড়ি ফিরল। আজ ফেট্টি বেঁধে ঘুরছে। মারপিট করেছে কোথায়। পরশু কার গাছ থেকে ডাব চুরি করে পাঁচিল টপকাচ্ছিল—তার ঠাকুরদা ধরতে গিয়েছেন, ঠাকুরদাকে কিনা ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে গিয়েছে! ঠাকুরদা ভাগ্যিস কাঁঠালগাছের গায়ে ঠেক খেয়েছিলেন! নইলে পড়ে গিয়ে এই বয়সে হাত-পা ভাঙলে কী হত? বউটি ছাদ থেকে দ্যাখে গুলটিদের উঠোনে দাঁড়িয়ে প্রতিবেশীরা নালিশ করছে। আর গুলটি গোঁজ মুখে দাঁড়িয়ে। গুলটির বাবা এক থাবড়া মারতেই গুলটি নিজের বাড়ির পাঁচিলে গিয়ে উঠল। বলল, বেশ করব ডাব চুরি করব। আবার করব। বুড়ো বয়সে ধরতে এল কেন দাদু? আমি তো মারিনি। পালাতে গিয়ে ধাক্কা লেগেছে। পাঁচিলে উঠে এইভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে-করতে উল্টোদিকে লাফ দিল গুলটি।

উল্টোদিকে এ-বাড়ি। কাকিমা গুলটিকে দরজা খুলে দিল। গুলটি পিছনের ফুটবল মাঠ ধরে হাওয়া। উঠোনে তখন গুলটির বাবা হাতজোড় করে ক্ষমা চাইছে। আর লোকে বলছে, অমন ভাইয়ের এমন দাদা হয় কী করে?

অমন ভাই মানে পান্টা। গুলটি বদমাইশ। পান্টা ভাল। ক্লাসে ফার্স্ট হয়, নয়তো সেকেন্ড। সেকেন্ডের নীচে কিছু হয়নি কোনওদিন পান্টা। পান্টা এবার হায়ার সেকেন্ডারি দেবে। মানে এগারো ক্লাস। এটা '৭৫ সাল। একবছর পরেই না কি এই এগারো ক্লাসের ফাইনাল পরীক্ষা উঠে যাবে শোনা যাচ্ছে। দশ ক্লাসের ম্যাট্রিক দেওয়া না কি ফিরে আসবে আবার। গুলটিও দেবে। কারণ দু'জনেই এক ক্লাসে পড়ে। ওরা তিন মিনিটের ছোট-বড়।

পান্টা হায়ার সেকেন্ডারির আগে টেস্ট পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছে। এখন রাত জেগে পড়ছে। পান্টার পড়ার ঘরও তিনতলায়।

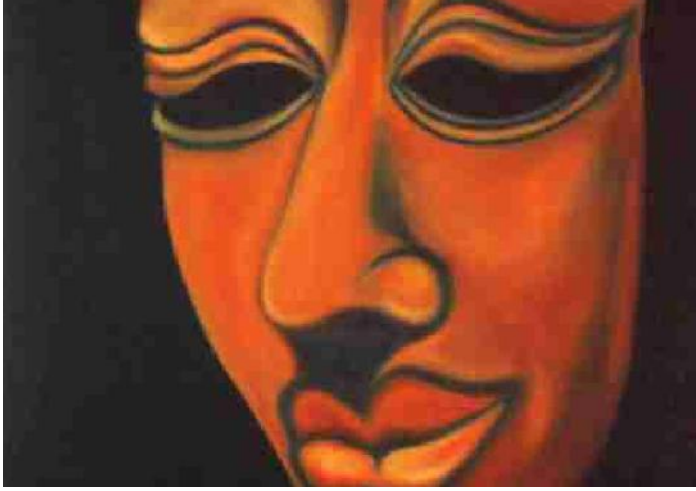

কাকিমার উল্টোদিকের ঘর। কাকিমার জানলার পর্দা সরালে দেখা যায় পান্টার পড়ার টেবিল। পান্টার ঘরের জানলাটায় তিনটের বদলে দু'টো গরাদ। মাঝেরটা নেই। মধ্যে বড় ফাঁক। কবে নাকি চোর এসে খুলে ফেলেছিল, আর লাগানো হয়নি। কাকিমা হাত-ইশারায় জানায়, পান্টা রাত হয়ে গিয়েছে, এবার শুয়ে পড়ো, তিনটে তো বাজে। আঙুল দিয়ে দেখায়, তিনটে। পান্টা হাসে। একবার ছাদে এল। ছাদে একটা জোনাকি! জোনাকি না। পান্টা সিগারেট ধরিয়েছে। কাকিমার ঘরে আলো জ্বলছে, তাই অন্ধকার ছাদে জোনাকি। কাকিমা বুঝবে না এ কি হয়? আলো জ্বালা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে কাকিমা চোখ বড় করে। বকুনির চোখ। মানে, কী-ই! সিগারেট খাওয়া? ক্লাস ইলেভেনের ছেলে হয়ে? পান্টা ভেবেছে কাকিমা দ্যাখেনি। কাকিমা ঘরের আলো নিভিয়ে ছুটল ছাদে। কার্নিশে ঝুঁকে, আঙুল দেখাচ্ছে—আঙুল দেখানোর মানে কী? ফ্যালো শিগগির। ফ্যালো। অনেক রাতে হাওয়া দিচ্ছে। কাকিমা নিচু গলায় বলে, ছিঃ ছিঃ! ফেলে দাও। ভোর হয়ে আসছে। শুয়ে পড়ো। পান্টা অন্ধকারে হাসে। চাঁদ ম্লান। নারকেল গাছ, নিমগাছ পাতা নাড়াচ্ছে। হিসহিস করে ধমকায় কাকিমা। কবে শিখলে? শিগগির যাও, শুয়ে পড়ো। দু'টো টান দিয়ে সিগারেট ফেলে দেয়। ছাদেই ফেলে। আহ্! আবার কাকিমার ফিসফিস ধমক। পান্টা ঝুঁকে পড়ে কার্নিশে। দু'টো বাড়িই বড়। ছড়ানো। ছাদ এঁকেবেঁকে গিয়েছে। ওদিকটায়, ওই পশ্চিমের দিকটায় গেলে, দু'টো ছাদ লাগোয়া হয়ে যায়। কাকিমা আবার হাত-ইশারায় ডাকে : এদিকটায় এসো। পান্টা যায়। সিগারেট তুলে আনো। পান্টা ছুটে ছাদের ফেলে আসা দিকটায় যায়। মুখ নিচু করে সিগারেটটা খোঁজে। তারপর পান্টার মাথা ঝুঁকে পড়ে। কাকিমা হাত-ইশারা করে বলে, আনো, এদিকে আনো। পান্টা ছাদের ওদিকটায় আসে। এখানে কাকিমাদের ছাদটা একটা ধাপ নেমে গিয়েছে। নীচের দিকে আবার খানিকটা ছাদ ছড়ানো। সেখান থেকে লোহার বাঁকানো একটা সিঁড়ি চলে গিয়েছে একতলায়। কাকিমা আঙুল দেখায় নিচু ছাদের দিকে। শাড়িটা গুটিয়ে সাবধানে নিচু ছাদে নামে, অন্ধকার তো, যদি পড়ে যায়! পান্টাদের ছাদ তখন লাগোয়া হয়ে গেল। পান্টা ফিসফিসে গলায় বলে : কী-ই? কাকিমাও ফিসফিসে গলায় বলে, 'ছাদে ফেলছ সিগারেটটা, সকালে যদি কেউ দেখে ফ্যালে!' পান্টা জিভ কাটে। কাছাকাছি থাকায় কাকিমা দেখতে পায়। তুমি সিগারেটটা এদিকে ছুড়ে দিতে পারবে? আমি ফুটবল মাঠের ওদিকটায় ফেলে দিচ্ছি। পান্টা শরীরটা সামান্য ঝুঁকিয়ে ছোড়ে। টপকে সিগারেটটা এ-ছাদে পড়ল। কাকিমা তুলেছে। কাকিমার ফিসফিস : এখনও জ্বলছে, দেখেছ! তা ছাড়া সবটাই আছে! সিগারেটটা ধরে জোরে-জোরে টান দেয় কাকিমা। পান্টা আকাশ থেকে পড়ছে। এ কি, আপনি সিগারেট খান? ফিসফিসে উত্তর। খাই তো। কিন্তু তুমিই তো সিগারেট খেতে জানো না। একদম ভিজিয়ে ফেলেছ লালায়। কিচ্ছু শেখোনি। কী করে টানতে হয় সিগারেট, জানোই না। পরে একদিন দেখিয়ে দেব। পান্টা অধৈর্য। না, এখন দেখান। কাকিমা ধমক দেয়। যাও, শুয়ে পড়ো। তিনটে বেজে গিয়েছে। বুড়ি উঠে পড়বে এবার।

পাড়ায় সকলেই জানে, বুড়ি তার ছেলেকে নিয়ে ঘুমোয়।

পান্টা বলে, কাল! তা হলে আগে-আগে, কেমন?

পরের দিন রাত দু'টো। পান্টা লাগোয়া ছাদ থেকে হাত বাড়িয়ে বাঁকানো রেলিং ধরল। এদিকের ওই একধাপ নিচু ছাদে এল। হাতে নতুন সিগারেট-দেশলাই। কাকিমা একবার টানে, পান্টা একবার। আবার কাকিমা ফিসফিসে, ছিঃ আবার ভিজিয়ে ফেলছ। জিভটা লাগাতে নেই। জিভটা, এরম, রাখতে হয়। এরম...এর-ম। কই, করো দেখি! ইস, তোমার লালা আমার মুখে লেগে যাচ্ছে।

এর একমাস পর, হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার সাতদিন দেরি। সবাই ঘুমোচ্ছে। হঠাৎ ধুপ করে একটা আওয়াজ। তখন শেষরাত। কী হয়েছে? পান্টা ছাদ থেকে পড়ে গিয়েছে। প্রথমেই 'মরা ডাক্তার'-কে ডাকা হল। 'মরা ডাক্তার' কী করবে? জ্ঞান নেই। রক্তও নেই কোথাও। কেটে-ছিঁড়ে যায়নি তেমন। ভোরে হাসপাতাল। হাসপাতাল থেকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হল বড় হাসপাতালে। মেরুদণ্ডে মারাত্মক চোট। ঘাড়ের একটু নীচের দিকে। মাথায় বড় আঘাত। মস্তিষ্কেও।

বাক্‌শক্তি হারিয়ে, চলচ্ছক্তি হারিয়ে ফিরে এল পান্টা। শুধু শুয়ে থাকে। একতলায়। নার্স রাখা হল। খাইয়ে দিতে হয়। গোঁ গোঁ আওয়াজ করে মাঝে-মাঝে। চোখ ভাষাহীন। সবাই বুঝল সারারাত পড়ত আর ছাদে পায়চারি করত, আলসে নেই তো! অন্যমনস্কভাবে পড়ার কথা ভাবতে ভাবতে অন্ধকার ছাদ থেকে পড়ে গিয়েছে। কী প্যাথেটিক! সবাই বলল। এত ভাল ছেলেটা। জড়পদার্থ হয়ে গেল এখনই। ১৭ পূর্ণ হত পরের মাসে। বোধশক্তি ও চলচ্ছক্তি হারিয়ে নীচের একতলায় শুয়ে থাকে পান্টা। গুলটি নিল ওপরের ঘরটা। তার আগে গুলটি হায়ার সেকেন্ডারি ফেল করেছে। সবাই জানে গুলটি তো এমনিই বড় জোর থার্ড ডিভিশন পেত। সেখানে বাড়িতে অত বড় দুর্ঘটনা! ও বেচারি পাশ করবে কী করে!

তাকে পারিবারিক ব্যবসায় বসিয়ে দেওয়া হল। গ্রিল তৈরির কারখানা আছে। চালের দোকান আছে বাজারে। একটা মনোহারি দোকানও আছে। বাবা এটায় বসলে, গুলটি ওটায় গেল। গুলটি ওটায় গেলে, বাবা বসল সেটায়। তিনটে ব্যবসা ঘুরে-ঘুরে দ্যাখে গুলটি। আপনিই বদমাইশি কমে গেল।

পান্টা রাতে আলো জ্বালিয়ে পড়ত। গুলটিও আলো জ্বালিয়ে রাখে। কেন? গুলটিও ওই পান্টার টেবিলটায় বসে-বসে পড়ে। কী পড়ে? খবর কাগজের মলাট দেওয়া বই। সব ক'টাতেই খবর কাগজের মলাট। গুলটি শুধু পান্টার খাটটা সরিয়ে জানলার ধারে করে নিয়েছে। ঘরে একটা আলমারি ছিল আয়না দেওয়া। খাট সরানোর জন্য, সেই আলমারিটাও সরাতে হয়েছে, জায়গা অনুযায়ী। গুলটি খুবই সিগারেট টানে। আলো জ্বালিয়েই টানে। মোটেই পান্টার মতো শুতে যাওয়ার আগে একখানা সিগারেট গুলটির বরাদ্দ নয়। পান্টা-গুলটি দু'জনেই লম্বা-চওড়া। পান্টার শরীরটা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গিয়েছে। সবাই জানে পান্টা বেশিদিন বাঁচবে না। গুলটি সকালে বেরয়। দুপুরে কোনওদিন খেতে আসে। কোনওদিন আসে না। আঠারো পেরিয়ে উনিশে পৌঁছেছে গুলটি। রাতে এসে আলো জ্বালিয়ে অনেকক্ষণ জাগে। একটা পাজামা আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরে ঘরের মধ্যে ঘোরে গুলটি। জানলার পর্দাটা তুলে দেয়। তার আগে, সতর্ক চোখে দেখে নেয় ওদিকটা। ওই ঘরটা কাকিমার ঘর। মারামারি করে যখন পালাত ওই ঘর বা ছাদ থেকে দেখে কাকিমাই হেল্প করত। নিশ্চিন্ত হয়, কারণ প্রত্যেকদিনই আলো নেভানো। প্রত্যেকদিনই পর্দা ফেলা। অন্ধকার ঘর। গুলটির রাত শুরু হয় বারোটার পরপরই। ওর ঘরে আলো জ্বলে ওঠে। সিগারেট টানে। টেপ রেকর্ডে গান বাজায়। জোরে নয় অবশ্য। কাকিমা জেগে যায় যদি! আর কী সব পড়ে। টেবিলটায় বসে-বসে পড়ে। খাটটায়

লম্বা হয়ে শুয়ে-শুয়ে পড়ে। খাটটা জানলার কিনারা পর্যন্ত উঁচু, বৃষ্টি এলে পাল্লা বন্ধ করতে হয়। বৃষ্টি না-এলে আলমারির লাগানো আয়নায় গুলটির শায়িত শরীরও দেখা যায়। পড়ার পর বই যে তোশকের নীচে ঢুকিয়ে দিচ্ছে গুলটি, দেখা যায় তাও।

কোথা থেকে দেখা যায়?

যদি কেউ এদিকের ছাদের এপারের জানলায় দাঁড়ায়। দেখা যায়। কিন্তু কেউ তো দাঁড়ায় না। পর্দা তো ফেলা। ঘর তো অন্ধকার।

ধরো, যদি-ই বা কেউ পর্দা সরায় বা ফাঁক করে, তবে দেখা যাবে। কিন্তু গুলটি তো নিশ্চিন্ত, ওদিকে সবাই ঘুমন্ত। রোজই যখন গুলটি ঘরে আসছে, পাশের অত বড় বাড়ি নিঝুম অন্ধকার। এক-একদিন গুলটি আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। তখন রাত কত? ওইরকম দু'টো-টুটো। ঘরে টিউবলাইট জ্বলছে। বড় আয়নাটায় গুলটির ফুলসাইজ ছবি দেখা যায়। গুলটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী করছে, দেখা যায়। গুলটি জানে গুলটি কী করছে তা দেখার কেউ নেই। গুলটির মুখ থেকে বেরনো আর্তনাদ শোনার কেউ নেই। গুলটি জানে। তাই গুলটি নিজেকেই দ্যাখে বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে।

একদিন গুলটি ওইরকমই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। সেদিন কিছুতেই আর হচ্ছে না। কিছুতেই আর লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে পারছে না গুলটি। গুলটির আর্তনাদ বাড়ছে। আর একবার করে খাটের ওপর থেকে বই তুলে দেখছে। আবার চেষ্টা করছে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। কিন্তু কেবলই যেন যার আসার কথা সে আসতে গিয়েও পিছিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ ভীষণ চমকে উঠল গুলটি। টেবিলটার ওপর ঠক করে কী একটা পড়ল। গুলটি তখন যে-অবস্থায় আছে, ওইরকম অবস্থায় একটা তুচ্ছ আওয়াজও ব্রহ্মাণ্ড চমকে দিতে পারে। যে-জিনিসটা পড়ল, সেটা টেবিলে ধাক্কা খেয়ে আলমারিতে লেগে মেঝেতে পড়ে গেল। গুলটি নিচু হয়ে তুলল। একটা গোল্লা পাকানো কাগজ। ভিতরটা শক্ত। মার্বেলের মতো। খুলতেই একটা বড় সুপুরি বেরল ভিতর থেকে। কাগজটা সুপুরিতে জড়ানো ছিল। অবাক হয়ে গুলটি তাকাল জানলার দিকে। সব অন্ধকার। এটা কী? দোমড়ানো কাগজটা হাত দিয়ে সমান করল গুলটি। কুঁচকে যাওয়া স্পষ্ট গোল লেখা : 'অত কষ্ট করছ কেন? ফোসকা পড়ে যাবে যে!'

গুলটির মাথার ওপর নিঃশব্দে একটা বাজ শান্তভাবে পতিত হল, এবং ওর সারা শরীর শিউরে দিয়ে পা বেয়ে নীচে মেঝেতে নেমে গেল। একবার। দু'বার।

সম্বিৎ ফিরে পেয়েই এক লাফে খাটে উঠে জানলা বন্ধ করল গুলটি।

তিন মিনিটও গেল না। আবার জানলা খুলল গুলটি। আবারও কিছু দেখা যায় না।

গুলটির অবিশ্বাস আর রোমাঞ্চ বিপরীতমুখী বিদ্যুৎ হয়ে সারা ঘরে চলাচল করছে। গুলটির গলা শুকিয়ে কাঠ। গুলটি নিচু হয়ে কুঁজো থেকে জল গড়াতে গেল। আবার খট্। গরাদ-ভাঙা জানলা দিয়ে আরেকটা সুপুরি। 'বোকা। আমি আছি তো! দেরি করছ কেন?' সুপুরি সমেত কাগজটা মুঠো করে বুকপকেটে রাখতে গিয়ে গুলটি টের গেল, সে স্যান্ডো গেঞ্জি পরে আছে! যা তার পেটের ওপর অনেকটা তোলা। গেঞ্জির কোঁচড়ে সুপুরিটা রাখল গুলটি। আবার জানলায় তাকাল। ওদিকটা অন্ধকার। গুলটি ছাদে এল। উল্টোদিকের ছাদেও একটি ছায়ামূর্তি। গুলটিকে কিছু শেখাতে হল না। ওদিকে, লাগোয়া ছাদটায় চলে গেল। ঘোরানো সিঁড়ির রেলিং ধরল একবার। তারপর ছেড়ে দিল। রেলিং ধরতে হবে কেন? ছোট লাফে ছাদ পার হয়ে পরের ওই একধাপ নিচু ছাদটায় এসে পড়া গুলটির কাছে কী? নস্যি!

চলে এল গুলটি। ঘণ্টাখানেক বাদে ফেরার সময় উল্টো লাফ দিল না। ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নর্মালি নেমে গেল।

দিন কাটছে দিনের মতো। বুড়ি মাঝে-মাঝে ভোরবেলা উঠে পাঁচিলের ধারে কাদায় পায়ের ছাপ আবিষ্কার করে। ছেলেকে ডেকে তোলে। চোর এসেছিল, বুঝলি? ছেলে ঘুম থেকে উঠে চোখ কচলায়। মা আর ছেলে তো ছোট থেকে একসঙ্গেই ঘুমোয়। এই পঞ্চাশ বছর বয়সেও ছেলে মা ছাড়া ঘুমোতে পারে না। বুড়ি হাঁপ ধরে বলে অনেকদিনই সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে পারে না। তাই মা-ছেলের শোওয়ার ঘরটা বউকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে কবেই। বৃষ্টি না-পড়লে, ঘোরানো সিঁড়ি দিয়েই উঠে আসে গুলটি। ঘোরানো সিঁড়ি দিয়েই ফেরে।

মাস তিনেক পর পান্টা মারা গেল। যেতই। সবাই ধরে নিয়েছিল। তাই কান্নার রোল উঠল না তেমন।

কিন্তু কান্না শোনা গেল তার দিন দশেক বাদে। প্রবল হাঁউমাঁউ কান্না। গুলটি-পান্টাদের বাড়িতে নয়। পাশের বাড়িটায়। সকালবেলা। বাড়ির কাজের লোক ঘরে ঢুকে দ্যাখে বউদিমণি মরে পড়ে আছে। জিভ বেরনো। চোখটা খোলা। কষে শুকনো রক্ত। শাড়ি হাঁটুর ওপর পর্যন্ত উঠে আছে। বন্ধ মুঠোয় একটা সবুজ কাপড়ের টুকরো।

বুড়ির চিৎকারে লোক জমল। পুলিশ এল। পাঁচিলের ধারে পায়ের ছাপ দেখা গেল। আগের দিন প্রথম রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। সহজেই গুলটিকে ধরল পুলিশ। গুলটির খাটের ওপর পাওয়া গেল একটা শার্ট, যার বুকপকেটের সামনেটা নেই। শার্টটা লুকনোর কিছুমাত্র চেষ্টা করেনি গুলটি। গুলটির টেবিলের ড্রয়ারে পাওয়া গেল গোটা ছয়েক সুপুরি। চিরকুট-মোড়া সুপুরি। জমিয়ে রেখেছিল গুলটি। ফেলতে পারেনি। তা ছাড়া এমনি চিঠিও ছিল গোটা দুয়েক।

শোনা গেল জোরাজুরি করতে হয়নি মোটেই। পুলিশের কাছে গুলটি সব স্বীকার করেছে।

হ্যাঁ আমি মেরেছি। ও আমার ভাইকে মেরে ফেলেছে, তাই আমি ওকে মেরেছি।

মেরে ফেলেছে মানে? বাড়ির বউ কী করে কাউকে মারবে?

গুলটি অনড়। মেরে ফেলেছে। ভাই ওর কাছ থেকে ফেরার সময় লাফ দিতে গিয়ে নীচে পড়ে গেল।

কী করে জানল গুলটি?

পান্টার শ্রাদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরদিন রাত্তিরে গুলটিকে নিজেই নাকি কাঁদতে-কাঁদতে বলেছিল বউটি। সঙ্গে-সঙ্গে গুলটি গলা টিপে মেরে ফেলেছে। মারার পরেও নাকি চড় মেরে-মেরে দেখেছে সাড়াশব্দ করে কি না। করেনি যখন, তখন বৃষ্টির মধ্যে বাঁকানো সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছে। গুলটি নাকি বলেছে, বেশ করেছি মেরেছি। ভাইকে ডাকত কেন ও? আমি তো তখনও ছিলাম। আমাকে ডাকতে পারত। মাঝখান থেকে ভাইটা মরে গেল।

যেদিন পুলিশ এসে গুলটিকে ভ্যানে তুলছে—পাড়ার লোক ভিড় করে আছে, গুলটির বাবা দারোগার হাতে-পায়ে ধরছে—তখন কিন্তু গুলটির মুখ অদ্ভুত শান্ত। কোনওদিন অত শান্ত গুলটিকে দেখা যায়নি। সবসময় ছটফট করত। এখন চুপ। মুখে কোনও টেনশন নেই। বুড়ি শুধু তারস্বরে চেঁচাচ্ছেন। বুড়ির অভিযোগ গয়না নিতে চেয়েছিল তাই খুন করেছে। কিন্তু গয়নায় আমি বউকে কোনওদিন হাত দিতে দিইনি। একতলার সিন্দুকে রেখেছি। চাবি আমার বালিশের তলায়। তাই নিতে পারেনি। পাড়ার দু'জন মহিলা বুড়িকে ধরে ভিতরে নিয়ে গেল। 'মরা ডাক্তার'-ও শান্ত। শুধু চুপচাপ তাকিয়ে আছে। দেখাতে আসা পেশেন্টদের দু'জন কম্পাউন্ডার-ই বলে দিচ্ছে আজ চেম্বার বন্ধ। পেশেন্টরা ফিরে যাওয়ার বদলে একবার মরা ডাক্তারকে দেখছে আর একবার গুলটিকে।

'মরা ডাক্তার' কিন্তু গুলটিকে দেখছেও না। এমনিই রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। একজন কম্পাউন্ডার এসে বলল, দেখবেন ডাক্তারবাবু, ও শালার নিশ্চয়ই ফাঁসি হবে! কম্পাউন্ডারের দিকে তেমনি ছুঁচলো করে তাকাল 'মরা ডাক্তার'। চশমার ফাঁক দিয়ে তাকাল। তার মুখে কোনও রেখা কাঁপছে না। যেভাবে রোগীর বাহ্যে কীরকম হয় বা জিহ্বা তেতো লাগে কি না শুনে প্রতিক্রিয়া দেয়, সেইভাবে 'মরা ডাক্তার' শুধু বলল, 'ও-ও-ও'!